Girischandra Ghosh Lectures 1947

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত বক্তৃতা
মার্চ ১৯৫৪

৩.০০ টাকা

উৎসর্গ

গিরিশচন্দ্র-স্মৃতি-রক্ষা সমিতির আয়োজন যিনি সার্থক করিয়া
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'গিরিশ বক্তৃতাবলী' প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন—
সেই স্মরণীয় ও বরণীয় স্বর্গীয় মহাত্মা

ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের

উদ্দেশে এই বক্তৃতা-গ্রন্থ অশেষ শ্রদ্ধার সহিত উৎসর্গীকৃত হইল

বিনীত
গ্রন্থকার

নিবেদন

যেমন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস লিখিতে হইলে বাঙ্গলার পুরুষসিংহ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের কীর্ত্তিকলাপের কথা বিশদরূপে বর্ণনা করিতে হয় তেমনই বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস লিখিতে হইলে গিরিশচন্দ্রের অমর অবদানের কথা বিস্তৃতরূপে উল্লেখ করিতে হয়।

কোন বিশেষ কারণে লেখককে ১৩০৭।১৩০৮ সালে বঙ্গীয় নাট্যশালার (প্রাথমিক) ইতিহাস সংগ্রহ করিয়া 'রঙ্গালয়' নামক সাপ্তাহিক পত্রে (বিশেষজ্ঞ নামে) প্রকাশ করিতে হয়। তখন মহাকবি গিরিশচন্দ্র বঙ্গীয় রঙ্গালয়ের একচ্ছত্র সম্রাট্ হিসাবে বিরাজ করিতেছেন। পরে ১৩১৮ সালে গিরিশচন্দ্রের মহাপ্রয়াণে—লেখক 'গিরিশ-গৌরব' নামে শোকোচ্ছ্বাসপূর্ণ ক্ষুদ্র কবিতা-গ্রন্থে—নাট্যাচার্য্যের উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন। তৎকালে বঙ্গের সুবিখ্যাত সংবাদপত্র অমৃতবাজার পত্রিকায় (ইং ১২ মার্চ, ১৯১২) এক বিস্তৃত প্রবন্ধে লেখক নটরাজের কীর্ত্তিকলাপের কথা উল্লেখ করেন। ঐ সময় সাহিত্যাচার্য্য সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত সাপ্তাহিক বসুমতী পত্রে গিরিশ-স্মৃতি সংখ্যা ও পরপর কয়েক সংখ্যায় সংক্ষিপ্ত-ভাবে গিরিশচন্দ্রের জীবনালোচনা করেন। পরে নাট্যমন্দির সম্পাদক—নাট্যকার ও নাট্যরথী অমরেন্দ্রনাথ দত্তের অনুরোধে পূর্ব্বোক্ত বঙ্গীয় নাট্যশালার (প্রাথমিক) ইতিহাস ও গিরিশচন্দ্রের জীবন-কথা (নাট্যমন্দির ২য়, ৩য়, ৪র্থ বর্ষ) বিস্তৃতভাবে লেখক কর্ত্তৃক আলোচিত হয়। উল্লিখিত 'গিরিশ-গৌরবের' শেষে লিখিত আছে—

পূরিবে কি একদিন যদিও শকতিহীন
অন্তরের দারুণ বাসনা ?—
প্রেমে তব পূর্ণ ছবি আঁকিবে এ দীন কবি,
বিভু পদে রহিল কামনা !

কিন্তু সে সুযোগ লেখক প্রাপ্ত হন নাই। পরে সে সঙ্কল্পও ত্যাগ করিতে হইয়াছিল ; নাট্যাচার্য্যের শেষ জীবনের সহচর ও লেখক সুহৃদ্বর অবিনাশচন্দ্র

গঙ্গোপাধ্যায় সে ভার গ্রহণ করিয়া লেখককে অব্যাহতি দেন। তাঁহার বিস্তৃত সংগ্রহমধ্যে লেখকের অল্পবিস্তর সাহায্য ছিল।

শেষে ভগ্নস্বাস্থ্য ও বার্দ্ধক্যে জরাজীর্ণ অবস্থায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনীষিবৃন্দ (Vice-Chancellor and the Syndicate) লেখককে ১৯৪৭ সালের Girischandra Ghosh Lectures দিবার জন্য নির্ব্বাচিত করিলে লেখক উল্লিখিত স্বীয় প্রার্থনা স্মরণ করিয়া পুনরায় বিস্তৃতভাবে গিরিশচন্দ্রের জীবনালোচনা করিবার সঙ্কল্প করেন। সেই গুরুভার নিজ ক্ষীণ স্কন্ধে বহন করিয়া লেখক গত মার্চ মাসে (১৯৫৪) যে চারিটি বক্তৃতা দেন তাহাই এই সঙ্গে প্রকাশিত হইল। কর্ত্তব্য যে পূর্ণ হয় নাই—সে বিষয়ে অক্ষম লেখক সম্যক্‌রূপে সচেতন। মহাকবি গিরিশচন্দ্রের নাট্যরত্নাকরে অবগাহন করিয়া মাত্র কয়েকটি রত্ন উদ্ধার করা হইয়াছে; সেই সঙ্গে ভক্তভৈরব গিরিশচন্দ্রের অতিসামান্য পরিচয় দিবার চেষ্টা করা হইয়াছে।

শেষ কথা—যাঁহাদের উৎসাহে অসমসাহসিকভাবে এই মহৎকার্য্যে লেখক উদ্বোধিত হইয়াছেন—তাঁহাদের কয়েকজনের নাম ধন্যবাদের সঙ্গে উল্লিখিত হইল :—সতীর্থ শ্রীসতীশচন্দ্র বসু, প্রথম গিরিশ অধ্যাপক ডক্টর হেমেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত, ডক্টর দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী, অধ্যাপক শ্রীকালীচরণ শাস্ত্রী, শ্রীনিবারণচন্দ্র ঘোষ, শ্রীমনোমোহন ঘোষ ও শ্রীশৈলজাকান্ত ভট্টাচার্য্য (যিনি স্বহস্তে এই প্রবন্ধ লিখিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতাগুলি পাঠ করিয়াছিলেন)—ইঁহাদের প্রত্যেকের নিকট লেখক কৃতজ্ঞ রহিলেন। এতদ্ব্যতীত ডক্টর তমোনাশচন্দ্র দাশগুপ্ত (সভাপতিরূপে), অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাংবাদিক ও সাহিত্যিক শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ (গিরিশ অধ্যাপক), ডক্টর সুকুমার সেন ও অধ্যাপক শ্রীসতীশচন্দ্র ঘোষ (কোষাধ্যক্ষ—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়) প্রমুখ মনীষিগণ বক্তৃতাকালে উপস্থিত থাকিয়া উৎসাহ দান করায় লেখক তাঁহাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

'লক্ষ্মী-নিবাস'
১, লক্ষ্মী দত্ত লেন, বাগবাজার,
কলিকাতা—৩
অগ্রহায়ণ, কৃষ্ণা-সপ্তমী
৩০ অগ্রহায়ণ, ১৩৬১

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত

গিরিশচন্দ্র

প্রথম পরিচ্ছেদ

মানুষ গিরিশচন্দ্র

বংশ-পরিচয় ও বাল্যজীবন

সন ১২৫০ সালের ১৫ই ফাল্গুন, সোমবার, ইংরাজী ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের ২৯শে ফেব্রুয়ারী (আনুমানিক) গিরিশচন্দ্র বাগবাজারস্থ বর্ত্তমান ১৩ নং বসুপাড়া লেনস্থিত ভবনে বালি সমাজের অন্তর্ভুক্ত ঘোষ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষদের আদি বাসস্থান খানাকুল কৃষ্ণনগর। তাঁহাদের এক শাখা তারকেশ্বরের নিকটস্থ হরিপাল নামক গ্রামে আসিয়া বাস করেন। গিরিশ-চন্দ্রের বৃদ্ধ-প্রপিতামহ কার্ত্তিকচন্দ্র বাগবাজারের কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীটে (বর্ত্তমান গৌড়ীয় মঠের গলি) আসিয়া বাস করিতে থাকেন। কার্ত্তিকচন্দ্রের সহধর্ম্মিণী স্বামীর সহিত সহমৃতা হইয়াছিলেন। গিরিশচন্দ্রের প্রপিতামহ রামলোচন ১৩ নং বসুপাড়া লেনস্থ বাটী ক্রয় করেন এবং এই বাটীই মহাকবির বাসস্থান। রামলোচনের দুই পুত্র—রামরতন ও হরিশ্চন্দ্র। রামরতনের পাঁচটি পুত্র—রামনারায়ণ, গঙ্গানারায়ণ, হরিনারায়ণ, নীলকমল ও মাধবচন্দ্র। প্রথম তিন পুত্রই নিঃসন্তান; কনিষ্ঠ মাধবচন্দ্র অবিবাহিত ছিলেন। রাম-রতনের চতুর্থ পুত্র নীলকমলের সাতটি কন্যা ও পাঁচটি পুত্র। গিরিশচন্দ্রের পিতা নীলকমল সিমলার মদন মিত্র লেন নিবাসী খ্যাতনামা চুণিরাম বসুর পুত্র রাধাগোবিন্দের মধ্যমা কন্যা রাইমণিকে বিবাহ করেন। গিরিশচন্দ্র রাইমণির অষ্টম গর্ভজাত সন্তান। অষ্টমগর্ভে শুক্লা অষ্টমী তিথিতে গিরিশচন্দ্র জন্মগ্রহণ করাতে তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত রামনারায়ণ উল্লসিত হইয়া বলিয়াছিলেন—'শুক্ল কৃষ্ণ ভেদ থাকিলেও এই তিথিতেই অষ্টমগর্ভে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন, এজন্য আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এই পুত্র আমাদের বংশ উজ্জ্বল করিবে।'

গিরিশচন্দ্রের মাতুল নবীনকৃষ্ণ বসু সুপণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। ইঁহারই প্রভাবে পাঠে অমনোযোগী বাল্যের গিরিশ ভবিষ্যৎ মহোজ্জ্বল জীবনের সন্ধান পাইয়াছিলেন।

রামরতন নিজে ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিলেও পুত্রগণকে সুশিক্ষিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে কনিষ্ঠের মৃত্যু ঘটে। মধ্যম গঙ্গানারায়ণ যশোহরের এক নীলকর অফিসে কার্য্য করিতেন; এবং নীলকমল বাবু কলিকাতায় সওদাগরী আফিসে কার্য্য করিতেন। জ্যেষ্ঠ রামনারায়ণ ও তৃতীয় হরিনারায়ণ পিতৃপদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিলেন।

গিরিশচন্দ্রের পিতা নীলকমল বাবু শান্ত ও গম্ভীর প্রকৃতির লোক ছিলেন। তাঁহার স্মৃতিশক্তি ও বিষয়বুদ্ধি ছিল অনন্যসাধারণ। তিনি দয়ালু, পরহিত-চিকীর্ষু ও দাতা ছিলেন। মিতব্যয়ী, বুদ্ধিমান্ ও দূরদর্শী বলিয়া পল্লীবাসী সকলে, কি বিষয় কর্ম্মে, কি সামাজিক ব্যাপারে, সর্ব্ববিষয়ে তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিতেন।

গিরিশচন্দ্রের মাতা রাইমণি, তাঁহার পিতামহ চুণিরামের দেবদ্বিজে অসাধারণ ভক্তিপ্রবণতার অধিকারিণী হইয়াছিলেন। তিনি সর্ব্বদাই সাধনা, অর্চ্চনা ও দেবদেবীগণের বন্দনাগানে এবং দান ও অন্যান্যভাবে পরসেবায় নিয়োজিত থাকিতেন। গিরিশচন্দ্র যে মাতাপিতার চারিত্রিক গুণাবলীর যোগ্য অধিকারী হইতে পারিয়াছিলেন, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই।

শৈশব

জ্যেষ্ঠতাত রামনারায়ণ অত্যন্ত আমোদপ্রিয় ও বিলাসী ছিলেন; কিন্তু তাঁহার প্রকৃতি ছিল অতিশয় উদার। কেহ কেহ বলেন, জ্যেষ্ঠতাতের দোষ-গুণগুলিও গিরিশচন্দ্রের চরিত্রে প্রতিফলিত হইয়াছিল।

গিরিশচন্দ্রের জন্মগ্রহণের অত্যল্পকাল পর হইতেই তাঁহাদের সংসার-মধ্যে নানা আধিদৈবিক দুর্ঘটনা ঘটিতে লাগিল। এক বৎসর কাল মধ্যে তাঁহার খুল্লপিতামহ হরিশ্চন্দ্র এবং জ্যেষ্ঠতাত মহাশয় পরলোকগত হইলেন। পরে তাঁহার মাতৃদেবীর নানা পীড়ার সঞ্চার হওয়ায় গিরিশচন্দ্র মাতৃস্তন্যে বঞ্চিত হইলেন। উমা নাম্নী এক দাসীর স্তন-পানে নব-শিশু বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। উমা একজন বাগ্দীকন্যা। গিরিশচন্দ্রের ভবিষ্যৎ জীবনে এই নীচজাতীয়া ধাত্রীমাতার প্রভাব যে ছিল না—তাহা কে বলিতে পারে। এই প্রসঙ্গে ঋষি-কবি সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয়ের 'মাতা'-শীর্ষক কবিতার নিম্নলিখিত দুইটি ছত্র বিশেষভাবে স্মরণীয়—

"স্তন পান করে যার প্রবৃত্তি প্রকৃতি তার,
আছে বিধাতার বিধি, অবশ্যই পায়।"

পাঠশালার পাঠ শেষ করিয়া অষ্টমবর্ষ বয়সে গিরিশচন্দ্র ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীতে প্রবেশ করিলেন। ইহার অল্পদিন পরেই গিরিশচন্দ্রের জ্যেষ্ঠভ্রাতার অকাল মৃত্যু ঘটিল। প্রথম পুত্রের অকাল মৃত্যুতে মাতাপিতা অধীর হইলেন। গিরিশচন্দ্র এখন একমাত্র আদরের সন্তান হইলেও শোক-তাপ-দগ্ধা মাতার নিকট সেরূপ যত্ন আদর পাইলেন না। গিরিশচন্দ্রের পর তাঁহার আর তিনটি ভ্রাতা জন্মগ্রহণ করে। শেষে এক মৃতা কন্যা প্রসব করিয়া গিরিশচন্দ্রের একাদশবর্ষ বয়সে গিরিশ-জননী ইহলোক ত্যাগ করিলেন। কয়েক বৎসর পরেই অসম্পূর্ণ ছাত্রজীবনে যৌবনের প্রারম্ভে চতুর্দ্দশবর্ষ বয়সে গিরিশচন্দ্র অকস্মাৎ পিতৃহারা হইলেন।

গৌরমোহন আঢ্যের পাঠশালা

অল্প বয়সেই গিরিশচন্দ্র দুর্ব্বিষহ ঘটনাস্রোতের আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া অভিভাবকশূন্য সংসারের কর্ত্তা হইয়া পড়িলেন। পরিজনগণের মধ্যে কয়েকটি অপোগণ্ড ভাই, আর গিরিশের জ্যেষ্ঠা ভগিনীই একমাত্র বাটীর গৃহকর্ত্রী। পিতৃবিয়োগের বৎসরান্তের অল্পকাল মধ্যেই ১৮৫৯ খৃঃ গিরিশচন্দ্র পঠদ্দশা অতিক্রম করিবার বহু পূর্ব্বে গিরিশচন্দ্রের বিবাহ হইয়া গেল। তখন তাঁহার বয়স মাত্র ষোল। তাঁহার জ্যেষ্ঠা ভগিনী কৃষ্ণকিশোরী অভিভাবিকা হইয়া Messrs. Atkinson Tilton Companyর Book-keeper শ্যামপুকুর নিবাসী নবীনচন্দ্র দেবসরকারের কন্যা প্রমোদিনীর সহিত গিরিশচন্দ্রের বিবাহ দেন।

ছাত্রজীবন

তিন বৎসর পর ১৮৬২ খৃঃ গিরিশচন্দ্র প্রবেশিকা পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হইয়া বিদ্যালয়ের সহিত সম্পর্ক ত্যাগ করিলেন।

লেখাপড়া ছাড়িলে সাধারণতঃ যেরূপ হয় গিরিশচন্দ্রও সেইরূপ আড্ডাধারী হইয়া এখানে সেখানে পাঠে বীতশ্রদ্ধ অন্যান্য যুবকদের সহিত মিশিয়া গল্পগুজবে দিন কাটাইতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে অনেকে তাঁহার প্রতিভার সহিত পরিচিত ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে প্রধানতঃ তাঁহার মাতুল নবীনকৃষ্ণ বসু এবং পল্লীবাসী সুশিক্ষিত সলিসিটর দীননাথ বসু ও পল্লীবন্ধু ব্রজবিহারী সোম (উত্তর কালে সাব্‌জজ্‌) প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁহাদের উপদেশে ও পরামর্শে গিরিশচন্দ্র বাড়ীতে বসিয়াই সারস্বত-সেবায় এমনভাবে নিজেকে নিয়োজিত করিলেন যে, তাঁহাকে 'Book-worm' আখ্যায় আখ্যায়িত করিতে পারা যায়। তদবধি জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত গিরিশচন্দ্রের এই অধ্যয়নস্পৃহা অব্যাহত ছিল।

মানুষের নিজের সাধনা ও অনুশীলনের দ্বারা যাহা অর্জিত হয় তাহা ব্যতীত আর-একটি বস্তু আছে যাহার নাম 'প্রতিভা'। উহা বাহিরের বা জন্মগত সংস্কারের গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে। প্রতিভার ঐন্দ্রজালিক স্পর্শের অনুভূতি কখন কোন ব্যক্তি কি হিসাবে পাইবার অধিকারী হইবে বা হয়, তাহা কেহ বলিতে পারে না। কারণ, অনেক সময় দেখা গিয়াছে, প্রতিভার মোহন স্পর্শ অজ্ঞাতসারে অপ্রত্যাশিতভাবে কোন কোন ব্যক্তিকে উদ্বুদ্ধ করে। মূর্খ মূক ব্যক্তিও অকস্মাৎ সারস্বত কৃপা পাইয়া মুখর, নানা কবিত্ব-শক্তিশালী ও পণ্ডিতে পরিণত হয়। কোথা হইতে এই 'নব নব উন্মেষশালিনী বুদ্ধি' জাগিয়া উঠে, তাহা বুঝা যায় না, বলাও যায় না। গিরিশচন্দ্রে সেইরূপ প্রতিভার বিকাশ দেখা যায়। বঙ্গবাণীর করুণাসম্পাতে গিরিশচন্দ্রের স্বাভাবিক প্রতিভা নূতনভাবে নূতন অনুরাগে জাগিয়া উঠে, তাই বংশপরম্পরায় উত্তরাধিকার-সূত্রে গিরিশচন্দ্রের যে তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সাধারণভাবে সুপ্ত ছিল তাহা বাণীর কৃপাকটাক্ষে বিকশিত হইয়া এমন উজ্জ্বলরূপ ধারণ করিল যে, বাঙ্‌লার বিদগ্ধসমাজ তাঁহাকে মহাকবি আখ্যায় ভূষিত করিলেন।

গিরিশচন্দ্রের প্রতিভা

গিরিশচন্দ্রের সহাধ্যায়ী রেভারেণ্ড অধ্যাপক কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় পাঠ্যাবস্থায়ই বলিয়াছিলেন,—"Girishchandra is a genius."

Mr. F. H. Skrine, I.C.S. গিরিশচন্দ্র সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন—"What little the world knows of its greatest men."

বিদ্যালয়ের পাঠ সাঙ্গ করিয়া গিরিশচন্দ্র মনের স্থৈর্য্য হারাইয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছিলেন। এই সময় তাঁহার শ্বশুর নবীনবাবু তাঁহাকে 'অ্যাট্‌কিনসন্ টিলটন্' কোম্পানীর অফিসে শিক্ষানবীশরূপে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। দুই চারি বৎসর চাকরী করিয়া অফিসের অন্যান্য সাধারণ কেরানীর মত গতানুগতিক পথে না চলিয়া তিনি 'বুক্-কিপার' ও 'একাউণ্টেণ্ট্'-এর পদ লাভ করিয়াছিলেন।

এই সময় গিরিশচন্দ্রের পত্নী, পুত্র সুরেন্দ্রনাথ ও কন্যা সরোজিনীকে রাখিয়া পরলোকগমন করেন।

পত্নীর মৃত্যুর পর গিরিশচন্দ্র 'অ্যাট্‌কিনসন্'-এর অফিস পরিত্যাগ করিয়া 'মেসার্স ফ্রাই বার্জার কোম্পানী'র অফিসে কর্ম্ম গ্রহণ করেন। পরে গিরিশচন্দ্র নানা কারণে 'ফ্রাই বার্জার কোম্পানী'র অফিস পরিত্যাগ করেন এবং সেই সময় তাঁহার বিশিষ্ট সুহৃদ মহাত্মা শিশিরকুমারের অনুরোধে ১৮৭৬ খৃঃ 'ইণ্ডিয়ান লিগে'র হেড্ ক্লার্ক ও ক্যাশিয়ার হন। এই স্থানে কার্য্য করিবার

সময় তিনি দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন। সিমুলিয়ার লালচাঁদ মিত্রের প্রপৌত্রী, বিহারীলাল মিত্রের প্রথমা কন্যা সুরথকুমারী তাঁহার দ্বিতীয়া পত্নী।

এক বৎসর ইণ্ডিয়ান লিগের অফিসে কার্য্য করিবার পর তিনি পার্কার কোম্পানীতে 'বুক-কিপার' নিযুক্ত হন। কিছুদিন তিনি আর্জেন্‌টি সিলিজির অফিসেও কার্য্য করেন।

গিরিশচন্দ্র অনেকগুলি সওদাগরী অফিসে চাকরী করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু কোথাও গোলামী করেন নাই। সর্ব্বত্র আত্মমর্য্যাদার সহিত স্বাধীনভাবে কাজ করিয়া গিয়াছেন। একবার এক সওদাগরী অফিসের বড়কর্ত্তার (পার্কার সাহেব) সহিত তাঁহার কথা কাটাকাটি হইয়াছিল। নির্ভীক গিরিশচন্দ্র উদ্ধত ফিরিঙ্গিকে এমন জবাব দিয়াছিলেন যে, শেষ পর্য্যন্ত সাহেবকে নিজের অপরাধ স্বীকার করিতে হয় এবং তাহার পর হইতে উক্ত সাহেব গিরিশচন্দ্রের সহিত বন্ধুজনোচিত আচরণ করিত, এমন কি, অফিসসংক্রান্ত কার্য্যে গিরিশ-চন্দ্রের পরামর্শও তাহাকে গ্রহণ করিতে হইত।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, দুর্ব্বিষহ ঘটনার আঘাতে গিরিশচন্দ্রের জীবন ক্ষত-বিক্ষত হইয়াছিল। বাল্যে মাতাপিতার ও ভাইভগিনীদের অনেকের মৃত্যু এবং যৌবনে পুত্র, কন্যা ও পত্নীদ্বয়ের মৃত্যুতে তাঁহার সাংসারিক জীবনের সুখশান্তি গুরুতররূপে ব্যাহত হইয়াছিল। গিরিশচন্দ্রের প্রথম পুত্র অকালে কালগ্রাসে পতিত হয়। ১৮৭৪ খৃঃ তাঁহার প্রথমা পত্নী পরলোকগমন করেন। তাঁহার দ্বিতীয়া পত্নীর গর্ভজাত দুই কন্যা শৈশবেই লোকান্তরিত হয় এবং ১২৯৫ সালে দ্বিতীয়া পত্নীও পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তিনি একটি শিশুপুত্র রাখিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সেই শিশুটিও মৃত্যুমুখে পতিত হয়। লোকে বলে গিরিশচন্দ্রের এই ছেলেটি শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপা লাভ করিয়াছিল। সে ঠাকুর লইয়া খেলা করিত, আর কারও কোলে উঠিত না; শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ন্যাসী শিষ্যগণকে ভালবাসিত. তাঁহাদের কোলে আনন্দে উঠিত, ঠাকুরের ছবির সামনে চোখ বুজিয়া বসিয়া থাকিত। একদিন ঠাকরের ছবি দেখিয়া খুব কাঁদিতে থাকে, লোকে মনে করিল সে ছবিখানি চাহিতেছে; তাই ছবিখানি তাহার হাতে দিতে যাওয়ায় দেখা গেল, ছবির পিছনে অসংখ্য পিপীলিকা বাসা পাড়িয়াছে, সেগুলি ঝাড়িয়া পরিষ্কার করিতে শিশুর কান্না থামিল। শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী গিরিশচন্দ্রের বাড়ীতে আসিলে শিশুটি তাঁহার কোলে উঠিয়া পরম তৃপ্তিলাভ করিত। রোগের যন্ত্রণায় শিশুটি কাঁদিতে থাকিত, তখন হরিনাম শুনাইলে ঘুমাইয়া পড়িত। দানিবাবু বলিয়াছেন, এই শিশু যখন গর্ভস্থ তখন মা কুলবধূ হইয়াও উন্মাদের ন্যায়

হরিবোল হরিবোল বলিয়া চীৎকার করিতেন। গিরিশচন্দ্র এই শিশুকে দেব শিশুজ্ঞানে পালন করিতেন। শিশুর শেষ অসুখে বহু চিকিৎসায় কোন উপকার হয় নাই বলিয়া তাহাকে লইয়া গিরিশচন্দ্র বায়ু-পরিবর্ত্তনের জন্য মধুপুরে যান; কিন্তু অবস্থা বিপর্য্যয়ে তিনি শীঘ্রই ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হন। পীড়া অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইলে স্বামী বিবেকানন্দকে তিনি একদিন বলেন—"নরেন, আমি একে কিছুতেই বাঁচাতে পাচ্ছি না, এর ওপরে আমার স্বত্ব ত্যাগ করলে যদি এর প্রাণ রক্ষা হয় তা'হলে তুমি একে সন্ন্যাস-মন্ত্র দিয়ে তোমাদের দলভুক্ত করে নেও।"

গিরিশচন্দ্রের আগ্রহে স্বামীজী শিশুর কর্ণে সন্ন্যাস-মন্ত্র দিয়াছিলেন। কিন্তু শিশু কিছুতেই বাঁচিল না। প্রায় তিন বৎসর বয়সে সে ইহলোক ত্যাগ করে। গিরিশচন্দ্রের ধারণা ছিল এই শিশুতে পরমহংস দেবের কৃপা মূর্ত্ত।

গিরিশচন্দ্রের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য

গিরিশচন্দ্রের জন্মের পূর্ব্বে তাঁহার অনেকগুলি ভাইভগিনী মারা যাওয়ায় তিনি বাড়ীর আদুরে ছেলে হইয়াছিলেন। অত্যধিক আদর পাওয়ার ফলে তাঁহার প্রকৃতি হইয়াছিল অত্যন্ত জেদী। একবার তাঁহাদের গৃহ-সংলগ্ন উদ্যানে শশা গাছে একটি শশা ঝুলিতে দেখিয়া শিশু গিরিশচন্দ্র বায়না ধরিল যে সে ঐ শশা খাইবে, কিন্তু জেঠাইমার কড়া নিষেধ, ও শশাটি গৃহদেবতা শ্রীধরকে না দিয়া কেহ খাইতে পারিবে না। গিরিশচন্দ্র সেই যে কান্না ধরিল কিছুতেই আর থামে না। পিতা বাড়ী আসিয়া গিরিশের দুঃখের কারণ অবগত হইলেন এবং শেষ পর্য্যন্ত জ্যেষ্ঠা ভ্রাতৃবধূকে বুঝাইয়া শ্রীধরের উদ্দেশ্যে রক্ষিত শশাটি আনিয়া দিলে তবে গিরিশের কান্না থামিল।

বাল্যে

এই জেদই উত্তরকালে গিরিশচন্দ্রের অসামান্য যশোলাভের সহায় হইয়াছিল। তিনি একবার যাহা করিবেন বলিয়া স্থির করিতেন তাহা সুসম্পন্ন না করিয়া কদাপি ক্ষান্ত হইতেন না। পাঠ্যাবস্থায় একদিন পল্লীর জমিদার ৺ ভগবতীচরণ গাঙ্গুলী মহাশয়ের বাড়ীতে হাফ্ আখড়াই শুনিতে গিয়াছিলেন। সরল সাদাসিধা পরিচ্ছদ পরিহিত একজন ভদ্রলোক সভাস্থলে প্রবেশ করা মাত্র সম্ভ্রান্ত শ্রোতৃমণ্ডলী শশব্যস্তে ও সসম্মানে তাঁহাকে অভ্যর্থনা জানাইতে অগ্রসর হইলেন। গিরিশচন্দ্র বিশেষ কৌতূহলী হইয়া ব্যাপারটা পর্য্যবেক্ষণ

করিতেছিলেন। পরে যখন জানিলেন এই সম্মানভাজন অতিথি কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত তখন গিরিশচন্দ্রের মনে 'কবি' হইবার প্রবল বাসনা জন্মিল এবং সেইদিন হইতে তিনি কবি হইবার জন্য সঙ্কল্পবদ্ধ হইলেন।

হেয়ার স্কুলে পাঠ্যাবস্থাতেই একদিন সহপাঠী গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বলিয়াছিলেন যে, সেক্‌স্‌পীয়ারের 'ম্যাক্‌বেথ' নাটকে যে ডাকিনীগণের (witches) সংলাপ আছে তাহা অনুবাদ করা দুরূহ। এই সময় গিরিশচন্দ্র কতকগুলি ইংরাজী কবিতার অনুবাদ করিয়া সহপাঠীদের শুনাইয়া ছিলেন। গুরুদাসবাবুর ঐ কথা শুনিয়া গিরিশচন্দ্র মনে মনে স্থির করেন মাত্র witch-দের কথা নয় সমগ্র 'ম্যাকবেথ' নাটকখানি তিনি অনুবাদ করিবেন। এ বিষয়ে গিরিশচন্দ্রের সাফল্যের কথা কাহাকেও নূতন করিয়া বলিবার আবশ্যক নাই।

পল্লীর যুবকগণের অনুরোধে গিরিশচন্দ্র 'শর্ম্মিষ্ঠা' যাত্রাভিনয়ের জন্য যে গীত রচনা করিয়াছেন উহাই সাধারণের নিকট গিরিশচন্দ্রের সর্ব্বপ্রথম প্রকাশ্য রচনা। গিরিশচন্দ্র ঐ যাত্রাদলের কতিপয় বন্ধুকে লইয়া বাগবাজার এ্যামেচার থিয়েটার নামে একটি নাট্য-সম্প্রদায় গঠন করিয়া রায়বাহাদুর দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশী' অভিনয় করেন। এই অভিনয়ের সাফল্য দেখিয়া শর্ম্মিষ্ঠা দলের কয়েকজন উদ্যোক্তা, যাঁহারা তখনও মধ্যে মধ্যে শর্ম্মিষ্ঠা গীতাভিনয় চালাইতেন, গিরিশবাবুকে বলেন—পর্দ্দার আড়াল থেকে prompting শুনে সকলেই সুখ্যাতি পেতে পারে, কিন্তু যাত্রার খোলা আসরে গান গেয়ে ও অভিনয় দেখিয়ে বাহাদুরী পাওয়া শক্ত। এই কথা শুনিয়া গিরিশবাবু উত্তর করিলেন—বেশ, শর্ম্মিষ্ঠা ছাড়া আর-একটি যাত্রার পালা গাইবার বন্দোবস্ত করে আটদিনের মধ্যে তোমাদের শুনিয়ে দেব। তাঁহার সঙ্গে এই নূতন গীতাভিনয়ের দলে নগেন্দ্রবাবু, অর্দ্ধেন্দু-বাবু, রাধামাধববাবু প্রভৃতি ছিলেন। সকলে মিলিয়া স্থির করিলেন যে, মণিলাল সরকারের 'উষাহরণ' নাটক অভিনয় করা হইবে; এবং এক রাত্রেই গিরিশবাবু উক্ত পালার জন্য ২৬ খানি গান বাঁধিয়া দিলেন এবং ১২৭৬ সালে জগদ্ধাত্রী পূজার দিন নগেন্দ্রবাবুর বাড়ীতে (বর্ত্তমান 'বলরাম মন্দির' নামক ৫৭, রামকান্ত বসু ষ্ট্রীটস্থ বাটী) ঠিক আটদিনের মধ্যে ঐ 'উষাহরণ' নাটক অভিনীত হইয়াছিল এবং গিরিশবাবুর যশ ছড়াইয়া পড়িল। একটি কথা এখানে বলা আবশ্যক, এই সময় সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা মতিলাল সুর মহাশয় সর্ব্বপ্রথম ইঁহাদের সহিত মিলিত হন।

শর্ম্মিষ্ঠা নাটকের গান- রচনা ও প্রকাশ্য কাব্য-জীবনের সূত্রপাত

'লীলাবতী' নাটক অভিনয়ের আয়োজনের সময়ের একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করিয়া এই প্রসঙ্গ শেষ করিব। যখন বৃন্দাবন পালের গলির শ্রীরাজেন্দ্রনাথ পালের বাটীতে 'লীলাবতী' নাটকের rehearsal চলিতেছিল তখন কোন ব্যক্তির মারফৎ গিরিশবাবুরা শুনিলেন যে, চুচুঁড়ায় সাহিত্যরথী বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও সাধারণী সম্পাদক অক্ষয়চন্দ্র সরকারের তত্ত্বাবধানে সম্প্রতি দীনবন্ধুর 'লীলাবতী' নাটকের অভিনয় হইয়া গিয়াছে এবং এতৎপ্রসঙ্গে ইহাও শুনিলেন যে, 'লীলাবতী' নাটকের নানা দীর্ঘ সংলাপ ছাঁটিয়া ছোট করিয়া অভিনয় করা হইয়াছে। গিরিশচন্দ্র এই কথা শুনিবামাত্র বলিলেন,—আমরা কিন্তু from beginning to end একটি কথা বাদ না দিয়া নাটকখানির যথাযথ অভিনয় করিব। কার্য্যতঃ তাহাই হইয়াছিল এবং অভিনয় রজনীতে গ্রন্থকার স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার নাটকের কোন অংশ বাদ যায় নাই দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন, এবং বলেন, 'এবার চিঠি লিখ্‌বো দুয়ো বঙ্কিম, বাগবাজারের কাছে চুঁচড়ো হেরে গেলো।' বলা আবশ্যক, উক্ত নাটকখানির মহড়া-কালে সুবিখ্যাত অভিনেতা মহেন্দ্রলাল বসু নটজীবনে প্রথম প্রবেশ করেন।

সাহিত্যাচার্য্য সুরেশচন্দ্র সমাজপতি টাউন হলের গিরিশ-স্মৃতিসভায় বলিয়াছিলেন :—

"গিরিশচন্দ্র যশের কাঙালী ছিলেন না। বন্ধুত্ব, আত্মীয়তার বিনিময়ে তিনি সমালোচনা, মোসাহেবী চাহিতেন না। স্তুতি-শুষ্ক বান্ধবতা গিরিশচন্দ্রের ললাটে বিধাতা লিখিয়া দিতে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। প্রকৃত প্রতিভা যশের ভিখারিণী নয়; সে যশকে—যশের আকাঙ্ক্ষাকে বিজয় করিতে পারে।"

গিরিশচন্দ্র জনপ্রিয়তালাভে উদাসীন ছিলেন

গিরিশচন্দ্র একজন খ্যাতিমান নাট্য-শিক্ষক ও নাট্যকার হইয়াও সমাজের সম্মান লাভের জন্য কখনও লালায়িত হন নাই। নিজ রচিত পুস্তকাদি—যাহা সংখ্যায় প্রায় একশত হইবে—সেগুলি সম্বন্ধে কে কি বলিবে সে বিষয়ে কোনদিন সন্ধান লইতে চেষ্টা করেন নাই। সমালোচনার জন্য পুস্তকাদি সংবাদপত্র-সম্পাদকদের নিকট কখনও পাঠান নাই। নাটকাদি অভিনয়ের সুখ্যাতি হইল কি-না, তদ্বিষয়েও তাঁহার কোন কৌতূহল ছিল না, কারণ, সুখ্যাতি ও অখ্যাতিতে কোন তারতম্য বোধ ছিল না। নাটক লিখিয়া লোক-শিক্ষক হইতে বসিলে যশের কাঙাল হইলে চলে না। কারণ, সমাজের প্রিয় অপ্রিয় সব রকম ঘটনার বা ব্যবহারের ছবি নাট্যকারকে আঁকিতে হইবে, তাহাতে সমাজ হৃষ্ট বা রুষ্ট দুই হইতে পারে।

সেজন্য অনেক সময় তাঁহাকে নিন্দাভাজন হইতে হইয়াছে। জনপ্রিয়তা অর্জনের জন্য যে সকল কৌশল ও চাতুরী আবশ্যক—সে সমস্ত ছিল তাঁহার প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। সমাজগত দোষের চিত্র যথাযথ বিচার না করিয়া অনেকে উহা ব্যক্তিগতভাবে গ্রহণ করিতেন এবং গিরিশচন্দ্রকে দোষারোপ করিতেন। কেহ কেহ (তাঁহাকে নির্য্যাতন করিতে, এমন কি) তাঁহার সহিত শত্রুতা করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। এইরূপ শত্রুতায় পীড়িত হইয়া কবি লিখিয়াছিলেন :—

"তুচ্ছ লোকে কুচ্ছ করে, লেখনী ধরিয়া করে
কখনো করিনি কারো কুরব রটন।"

সমাজের সম্পর্কে আসিয়া গিরিশবাবু বহুবার প্রতারিত হইয়াছিলেন এবং সমাজের প্রতি একটা বিদ্বেষ-ভাব তাঁহার মনে জাগিয়াছিল। 'হীরার ফুল' নামক গীতি-নাট্যের নিম্নলিখিত গীতটির মধ্যে তাঁহার সেই মনোভাব চমৎকার ভাবে ব্যক্ত হইয়াছে :—

"সাগর কূলে বসিয়া বিরলে, গণিব লহর-মালা,
মনোবেদনা কব সমীরণে, গগনে জানাবো জ্বালা।
প্রতারণাময় মানব-প্রাণ, আর না হেরিব নর-বয়ান,
সমাজ-শাসনে রহিব না আর, বহিব না দুখ ভালা।"

কবিগণ-মধ্যে একা গিরিশচন্দ্রই যে এইরূপ মনোবেদনা পাইয়াছিলেন তাহা নহে। আমরা রবীন্দ্রনাথের কাব্যজীবনের গুরু বিহারীলাল চক্রবর্ত্তীর 'বঙ্গসুন্দরী' নামক কাব্যের প্রথম সর্গ 'উপহার' হইতে অনুরূপ ভাব-দ্যোতক কিঞ্চিত অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :—

"আর কারে করি ভয়,
ব্যাঘ্রে সর্পে তত নয়
মানুষ-জন্তুকে যত ডরি।"

বাহির হইতে গিরিশচন্দ্রকে খুব গম্ভীর প্রকৃতির ব্যক্তি বলিয়া মনে হইত; এবং সহজে তাঁহার নিকট গিয়া বসিয়া আলাপ করিতে কেহ সাহস পাইত না। কিন্তু এটি তাঁহার আসল রূপ নহে। বালক, যুবক, বৃদ্ধ

দু'একটা দৃষ্টান্ত

—যে কেহ তাঁহার সম্মুখীন হইয়া যে কোন বিষয়ে তাঁহার সহিত আলাপ করিতে চাহিয়াছে যোগ্য সমাদরে তাহাকে গ্রহণ করিতে তিনি সর্ব্বদাই প্রস্তুত ছিলেন। বালকদের চাঞ্চল্য, তরুণদের

আবদার এবং বৃদ্ধের প্রগল্‌ভতা সবই তিনি হাসি মুখে সহ্য করিতেন। একদিন তিনি আহারে বসিয়াছেন এমন সময় পল্লীর একটি ব্রাহ্মণ-বালক তাঁহার অন্নের থালা ডিঙাইয়া ভিতর বাড়ীতে একখানা ঘুড়ি পড়িয়াছে দেখিয়া ছুটিয়া যায়। গিরিশবাবু ক্রুদ্ধ হইয়া চাকরকে বলিলেন—'ছেলেটা কে রে? ধরে নিয়ে আয়। বালককে আনা হইলে তিনি বলিলেন—'তোমার এতবড় স্পর্দ্ধা তুমি ভাত ডিঙিয়ে যাও।' বালকটি উত্তর করে—'বামুনে ভাত ডিঙ্গোলে দোষ হয় না।' গিরিশচন্দ্র উত্তেজিত হইয়া তাহাকে বলিলেন—'ভারি তো ব্রাহ্মণ, উড়ের দোকানে বেগুনি-ফুলুরী খাওয়া ব্রাহ্মণ আবার ব্রাহ্মণ।' বালকটি বলে,—'আমরা সে রকম ব্রাহ্মণ নই। আমরা দোকানের খাবার খাই না।' তাহাতে গিরিশচন্দ্র বলিলেন—'বটে, আচ্ছা, দেখবো তোমরা কি রকম ব্রাহ্মণ, আমি খোঁজ নেব।' বালককে ছাড়িয়া দেওয়া হইল এবং সে ঘুড়ি লইয়া পলায়ন করিল।

যুবকদের অনুরোধে তিনি গান বাঁধিয়া দিয়াছেন এমন কি বিবাহের পদ্যও রচনা করিয়া দিয়াছেন। ইহার জন্য কখন কিছুমাত্রও বিরক্তি প্রকাশ করেন নাই।

এক সময় শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে একটি Dramatic ক্লাব ছিল। সেই ক্লাবের এক বাৎসরিক উৎসবে কলেজের ছাত্রগণের গাহিবার উপযোগী একটি গান রচনার আবশ্যক হয়। সেই সময় আমাদের বাগবাজার পল্লীর শ্রীমনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় ঐ কলেজের ছাত্র ছিলেন। লেখকের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত থাকায় শ্রীমান্ মনোমোহন লেখককে এক পত্র লিখিয়া অনুরোধ করেন, কলেজের কয়েকটি ছাত্র আপনার নিকট যাইতেছে, ইহাদের লইয়া আপনি মহাকবি গিরিশচন্দ্রের নিকট যাইবেন ও আমাদের প্রার্থনা জানাইবেন। ইহা আমার বিশেষ অনুরোধ।

যুবকদের আব্দার রক্ষা

শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্রদের জন্য গান রচনা

তাহাদের সহিত আলাপ করিয়া তাহাদের সঙ্গে লইয়া আমি গিরিশবাবুর বাড়ীতে যাই। উঁহাদের আবেদন তাঁহাকে জানাইয়া একখানি গান বাঁধিয়া দিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করা হইল। একটু হাসিয়া তিনি স্বীকার করিলেন—'আচ্ছা বাবুজীরা, তোমরা যাও, শ্রীমান্ কিরণের মারফৎ আমি তোমাদের গান শীঘ্র পাঠিয়ে দেব।'

ছাত্রেরা ও আমি তাঁহাকে নমস্কার করিয়া বাড়ী ফিরিলাম। ছাত্রেরা কলেজে ফিরিয়া গেল। স্নানাদির জন্য প্রস্তুত হইতেছি, এই অবসরে মাত্র

১০।১২ মিনিট কাল মধ্যে গিরিশবাবুর বাড়ী হইতে একটি লোক এক পত্র লইয়া আসিল।

পত্র খুলিয়া দেখি—'তুমি যে ছাত্রদের জন্য গান চাহিয়াছিলে তাহা পাঠাইলাম।' গানটি এই :--

ইমন কল্যাণ—কাওয়ালী

"আমোদ তুমি আমোদ বটে সমান কোমল কঠিনে।
এস সরল-হৃদয় হৃদয়-নিধি, বিফল সব তোমা বিনে॥
লোহায় লোহায় যখন হে ঘসি,
তখন তোমার প্রয়াসী,
যখন কাটি পাষাণ, চায় সদা প্রাণ শ্রীমুখের হাসি;
(আছ) সুধী সঙ্গে, নাট্যরঙ্গে, দেখা দেও হে অধীনে।
প্রবীণা নও তো কভু, আমোদ চির নবীনে॥"

১৯০৫ সালে আর একবার ঐ কলেজের ছাত্ররা আসিয়া তাঁহাকে গানের জন্য ধরিয়াছিল এবং সেবারও তিনি একখানি গান বাঁধিয়া দেন।

১৯০৮ সালে গিরিশচন্দ্রের ৬৫তম বর্ষ বয়সে বাগবাজার লক্ষ্মীনিবাসের বালকগণ তাহাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার (লেখকের ভ্রাতুষ্পুত্র) বিবাহ উপলক্ষ্যে মহাকবির আশীর্ব্বাদরূপে একটি কবিতা লিখিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিলে তিনি হাসিমুখে ঐ আব্দার সহ্য করেন এবং বালকগণ বাড়ীতে ফিরিয়া আসিবার ১৫ মিনিট পরে মহাকবির আশীর্ব্বাদ হিসাবে বর ও বধূর নাম সংযুক্ত এক কবিতা আসিয়া পেঁছায়, উহা মুদ্রিত হইয়া বিতরিত হইয়াছিল।

ছাত্রদের বা যুবকদের অভিযান এইভাবে কতবার হইয়াছে বলিতে পারি না, আর একটি মাত্র দৃষ্টান্ত দিয়া এই প্রসঙ্গ শেষ করিব।

১৯০৮।১৯০৯ সালে বাগবাজারে লক্ষ্মীনিবাসে Baghbazar Social Union নামে একটি ক্লাবের প্রতিষ্ঠা হয়। এই ক্লাবের দুইটি বিভাগ ছিল—একটি সাহিত্য ও একটি নাট্য বিভাগ।

অধীনকে বয়োজ্যেষ্ঠ বলিয়া পল্লীবাসী শিক্ষিত যুবকসম্প্রদায়—যাঁহারা উক্ত ক্লাবের সদস্য ছিলেন—ক্লাবের পরিচালকের পদে বরণ করিয়াছিলেন। নাট্য বিভাগের জন্য সভাপতি পদে নাট্যসম্রাট গিরিশচন্দ্রের নাম প্রস্তাব

করা হয়। পল্লীর যুবকদের অনুরোধে গিরিশচন্দ্র এই পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত ঐ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

আমরা যখন তাঁহার কাছে মধ্যে মধ্যে যাতায়াত করিতাম, কয়েকজন প্রবীণ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও পল্লীবাসীকে তাঁহার সহিত আলাপ-রত দেখিতাম। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই শাস্ত্রের বিধান, দেশাচার ও লোকাচার সম্বন্ধে যে সকল কথা কহিতেন, তাহার মধ্যে আমরাই অনেক সময় তাঁহাদের ধারণা যে ভ্রান্ত তাহা উপলব্ধি করিতে পারিতাম। গিরিশচন্দ্র সেগুলি উপেক্ষার সহিত সহ্য করিয়া যাইতেন, কিন্তু কাহাকেও পরনিন্দা করিতে শুনিলে তিনি আর সহ্য করিতে পারিতেন না।

যৌবনের প্রথম ভাগ হইতেই গিরিশচন্দ্র বারনারী-সংশ্লিষ্ট রঙ্গালয়ের সহিত ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত থাকায় সমাজে তাঁহার বন্ধু-বান্ধবের সংখ্যা খুব অল্পই ছিল। এমন কি, দুর্নীতিপরায়ণ লোকেরাও সাধু সাজিয়া তাঁহার নিন্দাবাদ করিতেন।

পল্লীর মধ্যে গিরিশচন্দ্রের দু'একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু যে ছিল না তাহা নহে। একজনের কথা অন্ততঃ আমরা জানি, তিনি স্বর্গীয় লক্ষ্মীনারায়ণ দত্ত, যাঁহার

বন্ধু-প্রীতি

আলয়ে কোন বিশেষ পূজা উপলক্ষ্যে তিনি নানা অসুবিধা সত্ত্বেও একবার নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গিয়া সকল বিষয়ে সুবন্দোবস্ত দেখিয়া বড়ই আনন্দিত হন। কিছুদিন পর যখদ তাঁহার বন্ধুর অন্তকালে তাঁহাকে গঙ্গাতীরস্থ করা হয়, তখন সংবাদ পাইয়া গিরিশচন্দ্র তৎক্ষণাৎ গঙ্গাতীরে উপস্থিত হন। বন্ধুবর তাঁহার পূর্ব্ব ব্যবস্থা অনুযায়ী স্বরচিত একখানি সঙ্গীত শুনিতে শুনিতে দেহরক্ষা করেন। ইহা দেখিয়া গিরিশচন্দ্র বলিয়াছিলেন—'সকল কার্য্যেই তাঁহার সুবন্দোবস্ত ছিল, কিন্তু এরূপ বন্দোবস্ত করিয়া জীবন বিসর্জন দেওয়া একমাত্র ইষ্টদেবের মহিমা।'

কিন্তু যখন হইতে বারাঙ্গনা-সংশ্লিষ্ট নাট্যালয়ে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ন্যায় পুরুষোত্তমের শুভাগমন হইল ও গিরিশচন্দ্রকে তিনি আশ্রয় দিলেন, তখন একে একে তাঁহার বন্ধুসংখ্যা বৃদ্ধি পায়। এমন কি, শিক্ষিত সমাজের কয়েকজন মহামনীষী যথা মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ, ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার, কবিবর নবীনচন্দ্র সেন, সাহিত্যাচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র সরকার, বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির সভাপতি পণ্ডিত অক্ষয়কুমার মৈত্র, বিচারপতি সারদাচরণ মিত্র প্রভৃতি গিরিশচন্দ্রকে বন্ধু হিসাবে যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও সম্মান করিতেন।

গিরিশচন্দ্র তাঁহার মুক্তিদাতা পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণের ন্যায় সকল মানবের প্রতি সমান প্রীতি ও স্নেহ পোষণ করিতেন। তাঁহার আবাসে

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ত্যাগী শিষ্যসম্প্রদায় হইতে আরম্ভ করিয়া নাট্যালয়ের পতিতা অভিনেত্রীগণ ও চরিত্রহীন মদ্যপগণ সাদরে স্থান পাইত। সর্ব্বসাধারণের জন্য তাঁহার দ্বার উন্মুক্ত থাকিত।

পতিতাদের প্রতি তাঁহার উদার মনোভাবের একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিব। শোভাবাজার রাজবাড়ী হইতে 'সৌরভ' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। গিরিশচন্দ্র উহার সম্পাদক ও অমরেন্দ্রনাথ দত্ত উহার সহকারী সম্পাদক ছিলেন (১৩০৩ সাল)। উহার এক সংখ্যায় খ্যাতনামা অভিনেত্রী বিনোদিনী দাসী ও তারাসুন্দরী দাসী রচিত দুইটি কবিতা প্রকাশিত হইয়াছিল। পতিতা-লিখিত কবিতা সাহিত্যিকদের রচনার সহিত প্রকাশ করার কৈফিয়ৎ স্বরূপ গিরিশচন্দ্র সম্পাদক হিসাবে উহার শীর্ষদেশে যে ক্ষুদ্র একটি বিবৃতি লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন আমরা তাহার অংশবিশেষ নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :—

"সভ্য সমাজে আমার স্থান আছে কি না জানি না, জানিতেও চাহি না। রঙ্গালয়ে প্রবেশাবধি এখানকার অভিনেতা-অভিনেত্রীবর্গ আমার পুত্র-কন্যা স্বরূপ। তাহাদের গুণরাশি যাহাতে অপ্রকাশিত না থাকে তজ্জন্য এই কবিতা দুইটি প্রকাশ করিলাম।"

জীবনকালে কোন কোন সময় শুনা গিয়াছে যে, গিরিশচন্দ্র অন্যান্য অভিনেতা বা নাট্যকারদের প্রতিভার বিকাশপথে অন্তরায় ছিলেন, কিন্তু থিয়েটারের পরিচালক সুপ্রসিদ্ধ নাট্যাচার্য্য ও নাট্যকার বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়, নটকুলচূড়া মহেন্দ্রলাল বসু, খ্যাতনামা নট অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় (বেল বাবু) সঙ্গীতজ্ঞ অঘোরনাথ পাঠক ও নটরাজ অমৃতলাল মিত্র, নটকুলশেখর অর্দ্ধেন্দুশেখর এবং নৃত্যকলাকুশল নৃপেন্দ্রনাথ বসুর কৃতিত্ব বর্ণনা করিয়া তিনি যে সকল প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা হইতে বেশ বুঝা যায় গিরিশচন্দ্র কিরূপ গুণগ্রাহী ব্যক্তি ছিলেন।

রঙ্গালয়ে প্রকাশিত মহেন্দ্রলাল বসুর জীবনবৃত্তান্ত পাঠ করিয়া নাট্যাচার্য্য অমৃতলাল বসু গিরিশচন্দ্রের নিকট এক পত্রে লিখিয়াছিলেন :—

"আপনার লিখিত মহেন্দ্রের স্মৃতি-উপহার স্বরূপ সরল সত্য বিষাদ-গাম্ভীর্য্যপূর্ণ হৃদয়ের কথা কয়টি পড়িয়া ইচ্ছা হইতেছে যে, আমি যেন আগে মরি, আপনি আমায় মনে করিয়া দু'ফোঁটা চোখের জল ফেলুন। * * * সূর্য্যদেব আপনি সাবধানে অন্তরে রহিয়া চন্দ্রকে ফুটিতে দিয়াছেন; কিন্তু যে জানে সে বুঝিতেছে যে, সূর্য্যের কিরণই চন্দ্রে প্রতিফলিত হইয়া এত মনোহর হইয়াছে।"

গিরিশচন্দ্র তর্কে বড় পটু ছিলেন। তাঁহার সহিত তর্কে কেহ আঁটিয়া উঠিতে পারিতেন না। স্বামী বিবেকানন্দের সহিত তাঁহার গভীর অন্তরঙ্গতা ছিল। স্বামীজী তাঁহাকে যত ভালবাসিতেন ততোধিক শ্রদ্ধা করিতেন। উভয়ের মধ্যে বহুবার আধ্যাত্মিক বিষয়ে বহু তর্ক হইয়াছে এবং স্বামীজী তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন।

আমরা জানি যে স্বামী বিবেকানন্দ বেলুড় মঠ হইতে মাঝে মাঝে কলিকাতায় আসিয়া বলরামবাবুর বাড়ীতে বাস করিতেন। অবসর পাইলে বিশেষতঃ সন্ধ্যার পর দু'একজন গুরুভাই সঙ্গে লইয়া গিরিশচন্দ্রের সহিত দেখা করিতে যাইতেন। আলাপ একটু জমিলেই তত্ত্ব-কথা আরম্ভ হইত। প্রধান বিষয়—ব্রহ্ম বা ভগবান্ মানুষ হইয়া আসেন কি না। স্বামীজী বলিতেন—ব্রহ্ম মানুষ হইতে পারেন না। গিরিশচন্দ্র বলিতেন—আসেন ত বটেই, আসিয়াছেন আমি দেখিয়াছি" এই তর্ক সময় সময় দু'এক ঘণ্টা কাল চলিত।

গিরিশচন্দ্র ও বিবেকানন্দ

দু'জনেই মহাতার্কিক। বিতর্কে যুক্তিবিন্যাসে উভয়েরই সমান পটুতা। উভয়ের মধ্যে এই প্রকার দ্বন্দ্ব পুরাণবর্ণিত গজ-কচছপের যুদ্ধের ন্যায় প্রতিভাত হইত। দুই প্রতিভার এমন মিলন খুব কমই দেখা যায়। স্বামীজী বলিতেন —"গিরিশচন্দ্রের সহিত এই আলাপ—false talk. সময় কাটাইতে হইবে, কিন্তু কাহার সঙ্গে আলাপ করিয়া সময় কাটাই? গিরিশচন্দ্রের ভূয়োদর্শন অসামান্য। তাই এ সকল আলোচনা G. C.র সঙ্গেই করিয়া থাকি।" ফিরিয়া যাইবার সময় গুরুভাইদের উদ্দেশ্য করিয়া স্বামীজী বলিতেন—"আমার গুরুর অন্ততঃ এমন একজন শিষ্য আছেন—যাঁহাকে বিশ্বাসের অটল পাহাড় হইতে নামান যায় না।"

স্বামীজী গিরিশচন্দ্রের প্রতিভার কিরূপ সমাদর করিতেন সে সম্বন্ধে আর-একটি ঘটনার কথা এখানে উল্লেখ করিব। যখন স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ রামকৃষ্ণ মিশনের মুখপত্র 'উদ্বোধন' পত্রিকার সম্পাদনা করিতেছিলেন তখন তিনি স্বামীজীর নিকট হইতে এক পত্র পান। পত্রের পাঠটি এইরূপ :—সারদা, তুমি কতকগুলি পেন্সিল কাটিয়া এক বাণ্ডিল কাগজসহ আমাকে উদ্বোধনের জন্য প্রবন্ধ লিখিতে সঙ্গে দিয়াছ। কিন্তু তুমি ত জান না এদেশ কি রকম। এখানে পদার্পণ করা অবধি আমার নিঃশ্বাস ফেলিবার অবকাশ নাই। শ্রীজগদম্বা আমাকে নাকে দড়ি দিয়া খাটাইতেছেন। আমার কি প্রবন্ধ লিখিবার সময় আছে? তুমি এক কাজ কর—একখানা নোট বই, কি খাতা আর পেন্সিল পকেটে লইয়া তোমার পাড়ায় G. C. আছেন (স্বামীজী

গিরিশচন্দ্রকে G. C. বলিয়া সম্বোধন করিতেন) তাঁহার সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখা করিও। একটু বসিলেই তিনি আলাপ আরম্ভ করিবেন। তোমাদের সঙ্গে তিনি ঠাকুরের কথা বা ধর্ম্মকথা ছাড়া অন্য কথা বলিবেন না। মন দিয়া সেই কথাগুলি শুনিয়া নোট করিয়া লইবে এবং কার্য্যালয়ে ফিরিয়া আসিয়া সেইগুলি বিস্তৃত করিয়া লিখিয়া প্রবন্ধাকারে উদ্বোধনে প্রকাশ করিবে।

গিরিশচন্দ্র বড় কবি কি বড় নাট্যকার সে সম্বন্ধেও স্বামীজীর অভিমত বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। স্বামীজী বলিতেন গিরিশচন্দ্র নাট্যকার অপেক্ষা কবি হিসাবে অনেক বড়।

গিরিশচন্দ্রের প্রতি সিস্‌টার নিবেদিতার শ্রদ্ধা

সিস্‌টার নিবেদিতা বাগবাজারে আসিয়া বাস করিবার পর এখানকার ভক্তমণ্ডলী এক প্রস্তাব করেন যে, সিস্‌টার নিবেদিতাকে তাঁহার সুমহান্ স্বাথ-ত্যাগের জন্য একটি অভিনন্দন-পত্র প্রদান করা হোক্। কয়েকজন উচ্চশিক্ষিত ভক্তের উপর এই অভিনন্দন-পত্রের খস্‌ড়া রচনার ভার দেওয়া হয়। ঐগুলি প্রস্তুত হইলে সিস্‌টারের নিকট পাঠাইয়া যেটা তিনি নির্ব্বাচন করিবেন, সেইটাই তাঁহাকে প্রদত্ত হইবে—এইরূপ সিদ্ধান্ত করা হয়। শুনিয়াছি যে, রচনার খসড়াকারীদের কাহারও নাম ছিল না। পরে জানা গেল যে সিস্‌টার-নির্ব্বাচিত খস্‌ড়াটি মনীষী গিরিশচন্দ্রের রচনা। পূর্ব্বে ও পরে স্বামীজী এবং তাঁহার গুরুভাইদের মুখে গিরিশচন্দ্রের গুণাবলীর কথা শুনিয়া সিস্‌টার নিবেদিতা গিরিশচন্দ্রকে বরাবর বিশেষ শ্রদ্ধা ও সম্মানের চক্ষে দেখিতেন।

দার্জিলিং-এ নিদারুণ রোগশয্যায় শায়িত হইয়াও সিস্‌টার নিবেদিতা স্যার জগদীশচন্দ্র বসুর নিকট পীড়িত গিরিশচন্দ্র কেমন আছেন, জানিতে উৎকণ্ঠা প্রকাশ করেন। স্যার জগদীশচন্দ্র দার্জিলিং হইতে ফিরিয়া আসিয়া গিরিশচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং সিস্‌টার নিবেদিতা গিরিশচন্দ্রকে কিরূপ আন্তরিকভাবে ভালবাসিতেন মুগ্ধচিত্তে তাহা বর্ণনা করেন। তিনি আরও জানান যে, সিস্‌টার নিবেদিতা তাঁহার (স্যার জগদীশচন্দ্রের) ও তাঁহার অন্যতম সঙ্গী ডাঃ নীলরতন সরকারের সহিত প্রায়ই গিরিশচন্দ্রের বিশ্বাস-ভক্তি এবং নাট্য-প্রতিভা সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন।

পরনিন্দার প্রতি গিরিশচন্দ্রের বরাবরই একটা দারুণ বিদ্বেষ ছিল। কাহাকেও পরনিন্দা করিতে শুনিলে তিনি আর সহ্য করিতে পারিতেন না, তৎক্ষণাৎ প্রসঙ্গটি চাপা দিতে বলিয়া অন্য কিছু বক্তব্য থাকিলে তাহা

বলিবার জন্য অনুরোধ করিতেন। পরনিন্দার প্রতি তাঁহার অসহিষ্ণুতার একটা উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত আছে—শ্রীম লিখিত 'শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃতে'। ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার একবার কথা-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুরের সম্মুখেই অবতারদের সম্বন্ধে বিরূপ মন্তব্য প্রকাশ করেন। গিরিশচন্দ্র ইহা সহ্য করিতে না পারিয়া ডাঃ সরকারকে আক্রমণ করিয়া তুমুল তর্ক বাঁধাইয়া দিলেন। অবশেষে ডাঃ সরকার পরাজিত হন এবং গিরিশচন্দ্রের পদধূলি মাথায় লইয়া স্বামীজীকে উদ্দেশ্য করিয়া বলেন—'আর কিছু নয় হে, his intellectual power মানতে হবে।'

পরনিন্দার প্রতি গিরিশচন্দ্রের ঘৃণা

আর্ত্ত নারায়ণ-সেবা ও গিরিশচন্দ্র

সমাজের সাধারণ লোকের সঙ্গে মেলামেশা পছন্দ না করিলেও দুঃস্থ ও আর্ত্তদের প্রতি গিরিশবাবুর একটা চিরন্তন দরদবোধ ছিল। তাহার পরিচয় আমরা পাই তাঁহার হোমিওপ্যাথী চিকিৎসাবিদ্যার অনুশীলনে। প্রথমে চাকুরী করিবার সময় সহায়-সম্পদহীন দরিদ্র প্রতিবাসীরা চিকিৎসার অভাবে মৃত্যুকে বরণ করিতে বাধ্য হয় দেখিয়া গিরিশবাবু হোমিওপ্যাথী চিকিৎসা আরম্ভ করেন এবং কিছুকাল চালাইবার পর থিয়েটারের কাজে যখন আত্মনিয়োগ করেন তখন সময়াভাববশতঃ ডাক্তারি করা স্থগিত রাখিতে হয়। পরে রঙ্গা-লয়ের কার্য্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া পুনরায় ঐ চিকিৎসা বিষয়ে মনোনিবেশ করেন; এবং এজন্য তাঁহাকে বহু পুস্তকাদি ক্রয় করিয়া অধ্যয়ন করিতে হইয়াছিল। পল্লীর বহু দরিদ্র রোগী তাঁহার চিকিৎসাধীনে রোগমুক্ত হইয়াছে। শুধু তাহাই নহে, খ্যাতনামা এ্যালোপ্যাথী ডাঃ জ্ঞানেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলালকে তিনিই শেষে হোমিওপ্যাথী মতে চিকিৎসা করিতে প্ররোচিত করিয়াছিলেন। গিরিশবাবু ইতঃপূর্ব্বেই একজন সুবিজ্ঞ হোমিওপ্যাথী চিকিৎসকরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। একথা বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, তিনি সকল সময় চক্ষু মুদ্রিত করিয়া 'জয় রামকৃষ্ণ' বলিয়া ঔষধের বাক্সে হাত দিয়া যে ঔষধ প্রথম উঠাইতেন রোগীকে উহাই সেবন করাইয়া অত্যাশ্চর্য্য ফল পাইতেন। এখানে তাঁহার ঈশ্বর-বিশ্বাসের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই। গিরিশচন্দ্রের আর-একটি বিশেষ গুণের কথা উল্লেখ করা আবশ্যক।

গিরিশচন্দ্রের দৈব-শক্তিতে বিশ্বাস ও ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগে রোগীর চিকিৎসা

এটি তাঁহার ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ বা will force. ইচ্ছাশক্তির বলে তিনি কয়েকজনকে রোগমুক্ত করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের মধ্যে গিরিশচন্দ্রের পূর্ব্ববন্ধু গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, নাট্যাচার্য্য অমৃতলাল বসু, ব্যাঙ্ বাবুর বাল্য বন্ধু শ্যামপুকুরের উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

গিরিশচন্দ্রের আর একটি অলৌকিক গুণ ছিল এই যে, পত্র না খুলিয়াই তিনি পত্রের মর্ম্ম বলিতে পারিতেন। কিন্তু পরমহংসদেবের আশ্রয় লইবার পর হইতে তিনি এইসকল কার্য্য পরিত্যাগ করেন। কারণ, ঠাকুর বলিয়াছিলেন—"এ সব কাজ মানুষকে বুজ্‌রুক্ করে তোলে। এসব ভাল নয়।"

বৈজ্ঞানিক জ্ঞানানুশীলনে গিরিশচন্দ্রের স্পৃহা

বৈজ্ঞানিক শিক্ষার বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে গিরিশচন্দ্রের মনে বিজ্ঞান সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের বাসনা জাগে। তিনি ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারের প্রতিষ্ঠিত Indian Association for the Cultivation of Science নামক প্রতিষ্ঠানে সভ্যরূপে যোগদান করিয়া বিজ্ঞান সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের চেষ্টা করিতেন।

গিরিশচন্দ্রের কর্ত্তব্যনিষ্ঠা

গিরিশ-চরিত্রের একটি মহত্তম গুণ ছিল তাঁহার অনন্যসাধারণ কর্ত্তব্য-নিষ্ঠা। কর্ত্তব্যের অনুরোধে আত্মবলি দিতেও তিনি পশ্চাৎপদ ছিলেন না।

৩০-এ আষাঢ় ১৩১৮ (গিরিশচন্দ্রের তিরোভাব বৎসর) মিনার্ভা থিয়েটারে 'বলিদান' নাটকে গিরিশচন্দ্র 'করুণাময়ে'র ভূমিকা অভিনয় করিবেন বলিয়া বিজ্ঞাপিত হয়। সন্ধ্যার পর হইতে মুষলধারে বৃষ্টি হইতে লাগিল, তখন গিরিশচন্দ্র সেখানে উপস্থিত। অল্পসংখ্যক দর্শক আসিয়াছে—৫০৲ টাকায় অধিক টিকিট বিক্রয় হয় নাই। থিয়েটারের লেসী শ্রীমহেন্দ্রনাথ মিত্র গিরিশচন্দ্রকে তাঁহার ভগ্নস্বাস্থ্য আরও দুর্ব্বল হইবে এবং অল্পসংখ্যক দর্শক সমাগম হওয়ায় কষ্ট স্বীকার ব্যর্থ হইবে বলিয়া, অভিনয় করিতে নিষেধ করিলেন। কিন্তু গিরিশচন্দ্রের 'করুণাময়' অভিনয় দেখিবার জন্য এই দারুণ দুর্য্যোগেও ধীরে ধীরে প্রায় ৪০০৲ টাকার টিকিট বিক্রয় হইয়া গেল। গিরিশচন্দ্র তখন বলিলেন,—"এই দারুণ দুর্য্যোগেও যখন এতগুলি ভদ্রলোক আমার অভিনয় দেখিতে আসিয়াছেন, তখন তাঁহাদের আমি বঞ্চিত করিতে পারিব না। ইহাতে স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয় উপায় কি?" কিন্তু এই অভিনয় যে তাঁহার বাঙ্গলার রঙ্গমঞ্চে শেষ অভিনয়, তাহা কাহারও জানা ছিল না। অনাবৃত দেহে 'করুণাময়ে'র অভিনয় করিতে হইত। সেইজন্য সেই কাল-রজনীর

দারুণ শীতলতা তাঁহার রুগ্ন দেহকে আক্রমণ করিল এবং পর দিন হইতেই শরীর ভীষণভাবে অসুস্থ হইয়া পড়িল। নানা চিকিৎসা সত্ত্বেও তাঁহার শরীরের গ্লানি গেল না এবং হাঁপানি প্রবল হইতে লাগিল। এইভাবে কয়েক মাস কাটে, কিন্তু তখনও তিনি নিজ বাটীতে অভিনেতৃগণকে আহ্বান করিয়া কিছু দিন পূর্ব্বে রচিত ‘ তপোবল ’ নাটকের শিক্ষা দান করিতে লাগিলেন। তাঁহার কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ছিল এইরূপ। তিনি বলিতেন,—“ থিয়েটারই আমার ধ্যান-জ্ঞান, স্বপ্ন-জাগরণ ও আমার অস্তিত্ব।” সেই কালব্যাধিই কয়েক মাস পরে প্রবলতর হইয়া জগতের রঙ্গমঞ্চ হইতে তাঁহাকে স্বর্গের নাট্যশালায় পাঠাইয়া দিল।

সমাজের চোখে গিরিশচন্দ্র একজন আদর্শ-চরিত্র পুরুষ ছিলেন না। কারণ, যৌবনের প্রারম্ভ হইতেই তিনি রঙ্গালয় ও পতিতাদের সংস্রবে আসিয়া সামাজিক নীতি বিগর্হিত কতকগুলি অভ্যাসের দাস হইয়া পড়িয়াছিলেন। তথাপি তাঁহার চরিত্রে দৃঢ়তা ও কোমলতা—উভয়বিধ গুণেরই যে সন্নিবেশ হইয়াছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নট গিরিশচন্দ্র

নটগুরু

গিরিশচন্দ্রের নটজীবন

'মদে মত্ত পদ টলে
নিমে দত্ত রঙ্গ স্থলে
প্রথম দেখিল বঙ্গ
নবনটগুরু তার।'

১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে বঙ্গদেশে বিশেষতঃ কলিকাতার বহুস্থানে ইংরাজী ঐকতান বাদন (concert party) দল বসিয়াছিল। এই যন্ত্র-সঙ্গীত-সম্প্রদায় ইউরোপীয় ও দেশীয় যন্ত্র-সমন্বয়ে গঠিত। কিছুকাল পূর্ব্ব হইতেও মাঝে মাঝে এখানে সেখানে ধীরে ধীরে কতকগুলি সখের যাত্রার দল গীতাভিনয়-সম্প্রদায় গঠিত হইয়াছিল। বাগবাজারে নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাটীতে পূর্ব্বোক্ত এক concert-এর দল প্রতিষ্ঠিত হয়। গিরিশবাবু মধ্যে মধ্যে সেই concert দলের বন্ধুদের সহিত আলাপ করিতে যাইতেন। সেই সময় বন্ধুরা পরামর্শ করিয়া স্থির করেন যে, পল্লীতে একটি গীতাভিনয়-সম্প্রদায় গঠন করা হোক। গিরিশচন্দ্র তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ ও সুপণ্ডিত বলিয়া ধারণা থাকায়, সকলে তাঁহারই পরামর্শে মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'শর্ম্মিষ্ঠা' নাটকখানি অভিনয় করিবার প্রস্তাব করেন। তখন ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দ। এই নাটকের স্থানে স্থানে গীতাভিনয়ের উপযুক্ত গান থাকা উচিত মনে করিয়া, তাঁহারা তাৎকালিক শ্রেষ্ঠ গীতরচয়িতা বলিয়া প্রসিদ্ধ, হরি ঘোষ ষ্ট্রীট নিবাসী প্রিয়মাধব বসুমল্লিকের শরণাপন্ন হন। কিন্তু বার বার চেষ্টার পর ব্যর্থমনোরথ হইয়া সম্প্রদায়স্থ জনৈক সভ্য উমেশ-চন্দ্র চৌধুরী (পল্লী নিবাসী) গিরিশবাবুকে গান রচনার ভার লইতে অনুরোধ করেন এবং বলেন—"যদি পারি আমিও তোমাকে সাহায্য করতে প্রস্তুত

আছি।" সেই প্রস্তাব অনুযায়ী উভয়ে 'শর্ম্মিষ্ঠা'র গীতাবলী রচনা করিলেন। গিরিশচন্দ্র এই সর্ব্বপ্রথম গীতরচয়িতা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করিলেন। অবশ্য ছাত্রজীবনেও গিরিশচন্দ্র বাংলা রচনা ও বহু ইংরাজী কবিতার অনুবাদ করিয়াছিলেন। শর্ম্মিষ্ঠা গীতাভিনয় প্রায় বৎসরাধিক কাল ধরিয়া চলিতে থাকে। ইহার পর ১৮৬৯ খৃঃ গিরিশবাবুর উদ্যোগে একটি সখের থিয়েটার দল প্রতিষ্ঠিত হয় এবং উহার নাম হয় The Baghbazar Amateur Theatre. এই সম্প্রদায়ের জন্য গিরিশবাবুর প্রস্তাবে রায় দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশী' নামক প্রহসনখানি অভিনয়ের জন্য নির্ব্বাচিত হয়। শিক্ষার ভারও গিরিশ-চন্দ্রের উপরই ন্যস্ত হইল। বাগবাজারস্থ ৺প্রাণকৃষ্ণ হালদারের বাড়ীতে এই 'সধবার একাদশী'র প্রথম অভিনয় হয়। ভূমিকা বিতরণের পর অর্দ্ধেন্দুবাবু এই সম্প্রদায়ে যোগদান করায় গিরিশবাবু ও নগেন্দ্রবাবুর অনুরোধে তিনি 'কেনারামে'র ভূমিকা গ্রহণ করেন। অরুণচন্দ্র হালদার প্রথমে এই ভূমিকার জন্য মহড়া দিয়াছিলেন। স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই তিনি অর্দ্ধেন্দু-বাবুকে নিজ ভূমিকা ছাড়িয়া দেন। নিমচাঁদের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন স্বয়ং গিরিশচন্দ্র। রঙ্গমঞ্চে এই তিনি প্রথম নট হিসাবে অবতীর্ণ হইলেন। নিমচাঁদের ভূমিকা অভিনয় করিতে হইলে কয়েকটি ইংরাজী কাব্যের অংশবিশেষ আবৃত্তি করিতে হয়। সুতরাং ইংরাজী কবিতা আবৃত্তি করিতে দক্ষ এমন একজন সুশিক্ষিত অভিনেতার প্রয়োজন। গিরিশচন্দ্রের মুখে ইংরাজী কবিতার আবৃত্তি শুনিয়া দর্শকবৃন্দ কেবলমাত্র আনন্দলাভই করেন নাই—বিস্মিতও হইয়াছিলেন। এই 'সধবার একাদশী'র অভিনয় কলিকাতার নানা স্থানে সাতবার হইয়াছিল। ইহার চতুর্থ অভিনয় শ্যামবাজারের রায় রামপ্রসাদ মিত্র বাহাদুরের বাটীতে অনুষ্ঠিত হয়। কোন কারণে এই অভিনয়ে অর্দ্ধেন্দুবাবু পূর্ব্বে ঈশানচন্দ্র নিয়োগী-অভিনীত জীবনচন্দ্রের ভূমিকা এবং শ্রীঅবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় অর্দ্ধেন্দুবাবুর পূর্ব্বগৃহীত কেনারামের ভূমিকায় অভিনয় করেন। স্বয়ং নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র বন্ধু-বান্ধবসহ ও কলিকাতার কয়েকটি সম্ভ্রান্ত নাট্য-সম্প্রদায়ের সভ্যগণ এই অভিনয় দর্শনের জন্য উপস্থিত ছিলেন। অভিনয়ান্তে দীনবন্ধুবাবু গিরিশচন্দ্রের অভিনয়-প্রতিভা দর্শনে মুগ্ধ হইয়া বলেন— "গিরিশচন্দ্র, তুমি না থাক্‌লে এ নাটকের অভিনয় হ'ত না। নিমচাঁদের চরিত্র যেন তোমার জন্যই লেখা হয়েছিল।" গিরিশচন্দ্রের নটজীবনের এই অসামান্য সাফল্যের কথা তাৎকালিক দর্শকদের কেহই বিস্মৃত হন

নাই। তাই ৪৫ বৎসর পরও তাঁহার অন্ত্যেষ্টিতে Bengalee পত্রে লিখিত হইয়াছিল—"He was not only the founder of the Bengalee stage, but also its preserver. About forty-five years ago he appeared in Dinobandhu's inimitable role of 'Nimchand' before a cultured audience including tho author, and when he awoke the next morning he found himself famous as an actor." গিরিশচন্দ্রের অভিনেতৃজীবন নিমচাঁদে আরম্ভ। এই নিমচাঁদ যেমন অননুকরণীয়, তাঁহার অভিনীত স্বলিখিত 'সিরাজদ্দৌলার করিম-চাচা'ও অননুকরণীয়। ২৪ বৎসর বয়সে চাকুরী করিতে করিতে নাট্যানুশীলনে ব্রতী হইয়া ৬৮ বৎসর পর্য্যন্ত সেই নটজীবন তিনি সতেজ রাখিয়াছিলেন। শেষ বয়সেও তাঁহার অভিনয়চাতুর্য্যের কথা জনসমাজে সুবিদিত। গুরু-শিষ্য-সমরে আচার্য্য দ্রোণ শিষ্য অর্জ্জুনের নিকট পরাজিত—একথা আমরা মহাভারতে পাই। কিন্তু গিরিশচন্দ্র কর্ত্তৃক অভিনীত কোন ভূমিকা এ পর্য্যন্ত তাঁহার শিষ্যসহচরগণ কর্ত্তৃক অনুকৃত হয় নাই—একথা সকলেই বলিয়া থাকেন, এবং আমরা অনেকে জানি যে, তাঁহার প্রিয়তম শিষ্য 'ষ্টার' রঙ্গমঞ্চের প্রাণস্বরূপ বঙ্গের অভিনেতৃকুলোজ্জ্বল অমৃতলাল মিত্র মহাশয় গিরিশচন্দ্রের 'প্রফুল্ল' নাটকের শ্রেষ্ঠ ভূমিকা 'যোগেশ' চরিত্র অভিনয় করিয়া প্রভূত যশঃ অর্জ্জন করিয়াছিলেন। অবশ্য গিরিশচন্দ্রের শিক্ষকতার ফলেই তিনি এই যশঃ অর্জ্জন করেন। কিন্তু এক সময় এই 'যোগেশ' ভূমিকায় গুরুর সহিত অভিনয়-সমরে ব্রতী হইয়া তিনি গুরুর মহত্ত্ব উপলব্ধি করিয়াছিলেন ও স্বীয় অসম-সাহসিকতার জন্য যথেষ্ট লজ্জিত হন। এই অভিনয়-সমর ষ্টার থিয়েটার ও মিনার্ভা থিয়েটারে সংঘটিত হইয়াছিল। ষ্টার থিয়েটারের বিজ্ঞাপনে (Hand bill) লিখিত হয় গুরুকে চ্যালেঞ্জ করিয়া—"তোমার শিক্ষিত বিদ্যা দেখাব তোমায়।" কিন্তু ভগবদ্বিধানে গিরিশ-চন্দ্র অপরাজেয়।

একই নাটকে গিরিশচন্দ্র ভিন্ন ভিন্ন ভূমিকা, এমন কি, ঠিক বিপরীত রস-বৈষম্যযুক্ত নানা অংশ গ্রহণ করিয়া দর্শকমণ্ডলীকে বিস্ময়াভিভূত করিতেন। 'মেঘনাদ বধে'র 'রাম' ও 'মেঘনাদ,' এবং 'মাধবী কঙ্কণে'র সাতটি ও 'কপালকুণ্ডলা'র পাঁচটি ভিন্ন ভিন্ন ভূমিকায় একই কালে অভিনয় করিয়া তিনি যে অনন্যসাধারণ অভিনয়-কলাজ্ঞানের

পরিচয় দান করিয়াছিলেন—তাহা বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাসে চির-স্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

গিরিশচন্দ্রের এই বিপরীত রসবৈষম্যযুক্ত অভিনয় দেখিয়া 'ভারত উদ্ধার'-এর কবি বঙ্গের রসিক-শ্রেষ্ঠ স্বর্গীয় ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অক্ষয়-চন্দ্র সরকার সম্পাদিত 'সাধারণী'তে লিখিয়াছিলেন—"বঙ্গের গিরিশ অপেক্ষা যে কোন দেশে Garrik অধিক ক্ষমতাশালী অভিনেতা ছিল—ইহা আমাদের ধারণা হয় না। গিরিশচন্দ্র-কর্তৃক বঙ্গভাষায় রূপান্তরিত সেক্সপীয়ারের 'ম্যাক্‌বেথ' নাটক বঙ্গীয় রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হওয়াও আমাদের দেশের নাট্যশালার একটি মহতী প্রতিষ্ঠার কথা।" গিরিশবাবুর সংক্ষিপ্ত জীবনীলেখক বলেন—"তাঁহার পরিচালিত মিনার্ভা থিয়েটার নাকি এই 'ম্যাক্‌বেথ' নাটক অভিনয় করিয়া গভর্ণমেণ্টের নিকট First Class Theatre রূপে পরিগণিত হয়;" এবং এই অভিনয় সম্পর্কে 'ইংলিশম্যান' নামক অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইংরাজী দৈনিক পত্রের সুধী সম্পাদক লিখিয়াছিলেন—"A Bengalee Thane of cawdor is a lively suggestion of incongruity, but the reality is an admirable reproduction of all the conventions of an English stage."

Indian Daily News-এর Editorও এই ম্যাক্‌বেথের অভিনয় দেখিয়া সমস্বরে উচ্চ প্রশংসা করিয়াছিলেন।

সাধারণ জীবনের ন্যায় গিরিশচন্দ্রের নটজীবনও বহুতর ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতপূর্ণ ও বৈচিত্র্যময়। তিনি যে কেবল অভিনেতৃ-জীবন লইয়া নাট্যশালার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন, এমন নহে। নাট্যশালাসমূহে গিরিশচন্দ্র স্বয়ং অভিনেতা, অধ্যক্ষ, নাট্টাচার্য্য, নাট্যকার এবং প্রায় অনেক-গুলিরই প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। একাধারে কোন ব্যক্তিতে এত গুণের সমাবেশ সম্ভব নহে। অভিনয় করার উন্নতিসাধনে ব্যাপৃত থাকিয়া তিনি যেমন যশস্বী হইয়াছিলেন, নিন্দনীয়ও কম হন নাই। এমন কি, সমাজ-ঘৃণ্যও হইয়াছিলেন। কিন্তু তজ্জন্য আমরা তাঁহাকে ক্ষুব্ধ হইতে দেখি নাই। তিনি আক্ষেপ করিয়া লিখিয়াছিলেন বটে,—

"লোকে কয় অভিনয় কভু নিন্দনীয় নয়,
নিন্দার ভাজন শুধু অভিনেতাজন।
পরের বেদনা হায়, পরে কি বুঝিবে তায়,
হায়রে ব্যথার ব্যথী আছে কয়জন।"

কিন্তু এই মনোবেদনাও তিনি জয় করিয়াছিলেন ;—

"রঙ্গভূমি ভালবাসি, হৃদে সাধ রাশি রাশি,
আশার নেশায় করি জীবন যাপন!"

এই নটজীবন গ্রহণ করাতে তাঁহার বহু উচ্চ আশা পূর্ণ হইবে এবং বঙ্গের নাট্যান্দোলন কালে জয়যুক্ত হইবে, এই আশাই তিনি হৃদয়ে পোষণ করিতেন।

সাধারণের নিকট নটজীবন ঘৃণ্য হইলেও, তিনি নটের জীবনকে গৌরবময় মনে করিতেন।

তিনি যে একজন নট—ইহা তাঁহার মজ্জাগত ধারণা। তাহা না হইলে তিনি চাকুরী-জীবনের গৌরবময় পদ প্রত্যাখ্যান করিয়া যৎসামান্য অর্থের বিনিময়ে সাধারণের নিকট হেয়—এই অভিনেতৃ-জীবন গ্রহণ করিবেন কেন? ইহার মূলে তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল—ইহা ঈশ্বরেরই ইচ্ছা। এক সময় নট ও নাট্যকার বৃত্তি পরিত্যাগ করার সংকল্প প্রকাশ করায় শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহাকে বলিয়াছিলেন,—'না না ও থাক, ওতে লোক শিক্ষা হবে।' গিরিশচন্দ্র নিজেকে 'নোটো গিরিশ' বলিয়া পরিচিত বলিতেও লজ্জা বা কুণ্ঠা বোধ করিতেন না। একথার উল্লেখ আবশ্যক যে, তিনি তো নট ছিলেনই। তাঁহার একমাত্র পুত্র সুরেন্দ্রনাথ (দানি-বাবু)ও আজীবন নটবৃত্তি গ্রহণ করিয়া ও অভিনয়চাতুর্য্যের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া নাট্যপ্রিয় জনমণ্ডলীর প্রশংসাভাজন হইয়াছিলেন। উত্তর কালে গিরিশচন্দ্রের একমাত্র বংশধর তাঁহার দৌহিত্র দুর্গাপ্রসন্নবাবুও নটজীবন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

'ষ্টার' রঙ্গমঞ্চে 'কালাপাহাড়' নাটকের অভিনয়ে গিরিশচন্দ্র ও দানি-বাবু—বঙ্গীয় নাট্যশালার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অভিনেতৃদ্বয়—একই দৃশ্যে অবতীর্ণ হইয়া যে অপূর্ব্ব নাট্যরস পরিবেশন করিয়াছিলেন, তাহা আস্বাদন করিবার সৌভাগ্য যাঁহাদের হইয়াছিল তাঁহারা সত্যসত্যই ধন্য। প্রকৃত নট না হইলে পিতা-পুত্রে নটলীলায় এরূপে আত্মপ্রকাশ অসম্ভব। সেরূপ অভিনয় জগতে অতুলনীয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ-কর্ত্তৃক গিরিশচন্দ্র রামকৃষ্ণলীলার 'ভৈরব' রূপে আখ্যাত; কিন্তু নাট্যলীলায় তিনি ছিলেন প্রকৃত নটরাজ। তাই তিনি গাহিয়াছিলেন :—

"রঙ্গভূমি ভালবাসি" ইত্যাদি

গিরিশচন্দ্রের নটজীবনের সহিত সংশ্লিষ্ট কলিকাতার কয়েকটি রঙ্গালয় যথা—বাগবাজার এমেচার থিয়েটার, দি ন্যাশনাল থিয়েটার, গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার, ষ্টার থিয়েটার, এমারেল্ড থিয়েটার, ক্লাসিক থিয়েটার, কোহিনূর থিয়েটার, মনোমোহন থিয়েটার এবং পূর্ব্বে ও পরে মিনার্ভা থিয়েটার নাট্যকলা চর্চার বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠানরূপে কলিকাতাবাসিগণকে বরাবর গিরিশ-চন্দ্রের জীবনকালে নাট্যরস বিতরণ করিয়া আনন্দ দান করিয়াছে। জোড়া-সাঁকোর ঠাকুর-পরিবারস্থ, পাথুরিয়াঘাটার রাজ-পরিবারস্থ ও বেলগাছিয়া-পাইকপাড়ার রাজ-পরিবারস্থ অভিজাত-সম্প্রদায়ের উদ্যোগে সুপ্রতিষ্ঠ নাট্যালয়সমূহ ও তৎসঙ্গে কলিকাতার অন্যান্য স্থানের নাট্যাভিনয়ের আয়োজনে যে সকল নাটক অভিনীত হইত, তাহাতে কেবলমাত্র অভিজাত-সম্প্রদায় ও বিশিষ্ট পণ্ডিতগণ ব্যতীত জনসাধারণের প্রবেশাধিকার ছিল না। তৎকালে অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও কলিকাতার অন্যতম বিশিষ্ট ব্যক্তি শ্রীগৌরদাস বসাক লিখিয়াছিলেন :—

"The example set by the Belgatchia, Pathuriaghata and Jorasanko theatres paved the way for the establishment of several permanent public theatres that have now become standing institutions in our country for the amusement and instruction of the people."

দুঃখের বিষয়, স্বনামখ্যাত এই বহুদর্শী বিজ্ঞ সুধী বসাক মহাশয়ের মতের সহিত কোন কোন সম্প্রদায়ের মতের মিল হয় নাই।

কিন্তু একথা আমরা বলিয়া রাখিতে বাধ্য যে উপরিলিখিত নাট্য-সম্প্রদায়ের সরণী বা তৎপূর্ব্বে কলিকাতায় ইংরাজগণ অথবা স্বদেশীয়গণ-কর্ত্তৃক অভিনীত ইংরাজী নাটকের অভিনয় শৈলী গিরিশচন্দ্র অনুসরণ করেন নাই। গিরিশচন্দ্রের নাট্যশিক্ষাপ্রণালী তাঁহার নিজস্ব।

ইংরাজীতে সাধারণ আবৃত্তি ও অভিনয়ে (Recitation ও Acting) যে পার্থক্য আছে গিরিশচন্দ্রই সর্ব্বপ্রথম বঙ্গীয় নাট্যশালায় সেই পার্থক্য রক্ষার দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেন।

ইংরাজী প্রথা অনুযায়ী যাহা প্রকৃত ভাবাভিনয়—যে অভিনয়ে মস্তিষ্ক ও হৃদয় (head and heart)—উভয়ের চালনা হয়—যে অভিনয়ে অভিনেতা স্বীয় অস্তিত্ব ভুলিয়া আপনাকে অভিনেয় ভূমিকায় পূর্ণভাবে নিয়োজিত করে, তিনি এ দেশীয় রঙ্গমঞ্চে সেইরূপ অভিনয়ের প্রবর্ত্তন

করেন। অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়ের (বেলবাবু) অভিনয় সম্বন্ধে আলোচনা কালে গিরিশচন্দ্র যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন. তাহা হইতে তাঁহার অভিনয় কলার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা করা যায়। গিরিশচন্দ্র বলিয়াছিলেন, চরিত্র-উপলব্ধি ব্যতীত নট কখনও প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারে না। 'যে ভূমিকা অভিনয় করিতে হইবে, নটকে চিন্তাদ্বারা সেই ভাবাপন্ন হইতে হয়। বেলবাবুর অভিনয়ে নটের এই বাহ্য ও অন্তর্দৃষ্টির সূক্ষ্মতা বিশেষভাবে লক্ষিত হইত।'

গিরিশচন্দ্র যে সকল ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাহার প্রত্যেকটিকে রূপ দিবার জন্য নিজে সাধকের ন্যায় ধ্যানস্থ হইয়া সেই ভূমিকায় আপনাকে পরিবর্ত্তিত করিতে চেষ্টা করিতেন। ইহার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় যখন তিনি একই নাটকে বিভিন্ন রসাশ্রিত ভূমিকায়, বিশেষতঃ বিপরীত রসাশ্রিত ভূমিকায় (যথা—'মেঘনাদ' ও 'রাম') অভিনয় করিতেন।

এই ভাবাভিনয়ের বিষয়ে Sir Edwin Arnold তাঁহার ভ্রমণ বিবরণীতে লিখিয়াছিলেন :—"মনোবিজ্ঞান সম্ভূত উচ্চভাব সম্পন্ন নাটকের সুচারু অভিনয় তিনি বঙ্গনাট্যালয়ে দেখিয়াছেন এবং সেই সকল উচ্চ ভাব দর্শকবৃন্দেরও বিশেষ আদরণীয়—যাহা পাশ্চাত্ত্য প্রদেশে বিরল।" Lady Dufferin-এর পুস্তকে বঙ্গনাট্যশালার উচ্চ প্রশংসাবাক্যের উল্লেখ আছে।

অনেকেই হয়ত লক্ষ্য করিয়াছেন, গিরিশচন্দ্রের বহুপ্রকারের প্রতিকৃতির মধ্যে অভিনেতার ভূমিকার সহিত একাত্মানুভূতির জন্য in actor's mood-এর একখানি ছবি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে রক্ষিত আছে এবং পরবর্ত্তী কালে প্রকাশিত গ্রন্থাবলীর মধ্যেও উহা মুদ্রিত হইয়াছে।

গিরিশচন্দ্রের শিক্ষাপ্রণালীর এমনই বৈশিষ্ট্য যে, একবার 'প্রফুল্ল' নাটকের অভিনয়কালে 'ষ্টার' রঙ্গমঞ্চের দর্শকমণ্ডলীর মধ্য হইতে কলিকাতা করপোরেশনের ভাইস্ চেয়ারম্যান শ্রীগোপাললাল মিত্র মহাশয় ডাক্তারগণ-কর্ত্তৃক যাদবকে বিষ প্রয়োগের দৃশ্য দেখিয়া এমন অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, অকস্মাৎ "constable খুন হোতা হায়,—constable খুন হোতা হায়,—পাকড়ো" বলিয়া চিৎকার করিয়া উঠিয়াছিলেন।

গিরিশচন্দ্রের সহিত যাঁহারা ঘনিষ্ঠভাবে মিশিতেন তাঁহাদের অনেকের কাছে তিনি আক্ষেপ করিয়া বলিতেন—"কলাদেবী আমায় যতটুকু দিয়েছেন ততটুকু যদি উজাড় করে ঢেলে দিতে পারতুম, তবে অভিনয়

আরও সুন্দর হোতো। কিন্তু সবটুকু গ্রহণ করা সকলের শক্তিতে কুলোয় না। তাই আমাকে কে কতটুকু ধারণক্ষম সেকথা ভেবে নিয়ে তবে শিক্ষা দিতে হয়।" গিরিশচন্দ্রের বহু কৃতী শিষ্য যথা,—মহেন্দ্রলাল বসু, অমৃতলাল মিত্র প্রভৃতি যে সুযশ অর্জন করিয়া গিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

শ্রীশ্রীঠাকুর বলিতেন যে, তাঁহার সম্মুখে কেহ উপস্থিত হইলে 'মা' তাঁহাকে দেখাইয়া দিতেন কোন লোক কি রকম; সেইরূপ গিরিশচন্দ্রের নিকট অভিনেতৃ-পদপ্রার্থী হইয়া কেহ উপস্থিত হইলে, নাট্যকলাদেবীর কৃপায় তিনি তাঁহাদের সহিত আলাপ করিয়া ও ভাবভঙ্গি দেখিয়া বুঝিতে পারিতেন, কাহার ভিতর কতটুকু শক্তি আছে এবং তদনুযায়ী তিনি তাঁহাদিগকে শিক্ষা দিতেন। ইহাই বোধ হয় গিরিশচন্দ্রের শিষ্যবর্গের সাফল্যের অন্যতম প্রধান কারণ।

এই প্রসঙ্গে দু'একটি ঘটনার কথা এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে। নটজীবনের প্রথম ভাগে যখন শ্যামবাজারস্থ রাজেন্দ্র পালের বাড়ীতে বাগবাজার এমেচার থিয়েটার প্রথম ন্যাশনাল থিয়েটার নাম লইয়া দীনবন্ধু মিত্রের 'লীলাবতী'র মহড়া দিতেছিল তখন একদিন মহড়ার ঘরে গিরিশ-চন্দ্রের সম্মুখে একটি সম্ভ্রান্ত সুদর্শন যুবক অকস্মাৎ প্রবেশ করিয়া গিরিশ-চন্দ্রের উদ্দেশ্যে বলেন,—"মহাশয়, আমাকে একটি পাট দিতে পারেন?" গিরিশচন্দ্র উত্তর করিলেন,—"তুমি আবার কি পাট নেবে হে?" "ঐ যে পাড়াগেঁয়ে ছেব্‌লা জমিদার 'ভোলানাথ' ঐ পাটটা আমায় দিলে চল্‌বে।" যুবকের উচ্চারণ ও কথা বলিবার ভঙ্গি দেখিবামাত্র 'নটগুরু' গিরিশচন্দ্র আধারটিকে চিনিয়া লইলেন এবং তাহাকেই ভোলানাথের ভূমিকা দেওয়া হইল। ইনিই স্বনামধন্য প্রসিদ্ধ নটকুল-ধুরন্ধর মহেন্দ্রলাল বসু; বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চে মহেন্দ্রলালের অভিনয় কলার পরিচয় অনাবশ্যক।

আর এক সময় নটকুলশেখর অর্দ্ধেন্দুশেখর মিনার্ভা থিয়েটারে আবু হোসেন অভিনয় করিতে করিতে দল পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া যাওয়ার পরবর্ত্তী শনিবার, আবু হোসেনের অভিনয় যাহাতে বন্ধ না হয় তজ্জন্য গিরিশচন্দ্র নৃত্যগীতকুশলী ও পটু অভিনেতা শ্রীগোবর্দ্ধন বন্দ্যোপাধ্যায়কে ঐ ভূমিকায় অভিনয় করিতে আহ্বান করেন। গোবর্দ্ধন বাবু, আশ্চর্য্যের বিষয়, এমন নিখুঁতভাবে 'আবু হোসেনে'র অভিনয় করিয়াছিলেন যে, দর্শকগণ উক্ত ভূমিকায় অভিনেতার পরিবর্ত্তন কিছুমাত্র উপলব্ধি করিতে সক্ষম হন নাই।

আর একবার ঐ আবু হোসেনের দাই-মসুরের দ্বৈত-গীত ও নৃত্যের সহযোগী অভিনেতা শ্রীশরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (রানুবাবু) দল ত্যাগ করায় উক্ত ভূমিকা পূর্ব্বোক্ত গোবর্দ্ধনবাবুর দ্বারা সুসম্পন্ন করান হয়। ইহা দ্বারা সপ্রমাণ হইল কোন্ অভিনেতার কতটুকু প্রতিভা আছে—গিরিশচন্দ্র তাহা বুঝিতে পারিতেন এবং উক্ত অভিনেতাদের পাট গ্রহণে দ্বিধা থাকা সত্ত্বেও গিরিশচন্দ্রের প্ররোচনায় শেষ পর্য্যন্ত তাঁহারা অভিনয় করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। একজন অভিনেত্রী 'বিবাহ-বিভ্রাটে'র ঝিয়ের ভূমিকা গ্রহণ করিয়া প্রথম রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হন। গিরিশচন্দ্র তাঁহার প্রতিভার আবিষ্কার করিয়া তাঁহাকে একে একে বিভিন্ন 'নাম-ভূমিকা'য় যথা—জনা, করমেতি বাই, লেডি ম্যাক্‌বেথ ও এমন কি নৃত্যগীত-পটীয়সী আবু হোসেনের দাইরূপে দর্শকের সম্মুখে উপস্থিত করিয়া প্রচুর যশের অধিকারিণী করিয়াছিলেন। ইনি স্বনামধন্যা অভিনেত্রী তিনকড়ি দাসী।

গিরিশচন্দ্র বিভিন্ন নাটকে যে সকল চরিত্রের অভিনয় করিয়াছিলেন সেগুলির মধ্যে যে কয়টি প্রধান সে কয়টির উল্লেখ করিয়া বর্ত্তমান প্রসঙ্গ শেষ করিব।

'সধবার একাদশীতে' গিরিশচন্দ্র নিমচাঁদের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন, 'লীলাবতী নাটকে ললিত,' 'নীলদর্পণে I. I. Wood' (মেও হস্‌পিটালের সাহায্য রজনীতে টাউন হলে অভিনীত) 'কৃষ্ণকুমারী নাটকে মহারাণা ভীমসিংহ' (a distinguished amateur নামে), 'মেঘনাদ বধ নাটকে মেঘনাদ' ও 'রাম,' 'বিষবৃক্ষে নগেন্দ্র,' 'পলাশীর যুদ্ধে ক্লাইভ,' 'দুর্গেশনন্দিনীতে বীরেন্দ্রসিংহ,' 'মৃণালিণীতে পশুপতি,' 'সীতারামে সীতারাম।'

নিজের রচিত 'রাবণ-বধ,' 'লক্ষ্মণ-বর্জন,' 'সীতার বনবাস,' 'রামের বনবাস' নাটকে 'রামে'র ভূমিকায়, 'দক্ষযজ্ঞে দক্ষ' (অধীন গিরিশচন্দ্র ঘোষ), 'কালাপাহাড়ে চিন্তামণি,' 'মায়াবসানে কালী-কিঙ্কর,' 'জনায় বিদূষক,' 'প্রফুল্ল নাটকে যোগেশ,' 'বলিদানে করুণাময়,' 'ভ্রান্তিতে রঙ্গলাল,' 'ম্যাক্‌বেথ-এ ম্যাক্‌বেথ,' 'পাণ্ডব গৌরবে কঞ্চুকী,' 'সিরাজদ্দৌলায় করিমচাচা।' মনীষী বাল গঙ্গাধর তিলক কংগ্রেসের অধিবেশন উপলক্ষ্যে কলিকাতায় আসিয়া 'সিরাজদ্দৌলা' নাটকের অভিনয় দর্শন করেন এবং পরে গিরিশবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার নাটক ও চরিত্রাভিনয়ের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন।

গিরিশচন্দ্র জানিতেন যে বঙ্গীয় শিক্ষিত সমাজ নানা কারণ দর্শাইয়া বঙ্গীয় রঙ্গালয়ের অভিনয়ের সাজসজ্জার, অভিনেতার ক্রটি-বিচ্যুতির কথা উল্লেখ করিয়া বহু নিন্দাবাদ ও বিদ্বেষ মাঝে মাঝে প্রচার করিয়া থাকেন। আবার সুধী-মধ্যে অনেক বরেণ্য ব্যক্তিও নাট্যশালা, অভিনয় ও সঙ্গীতাদির উচ্চ প্রশংসা করিয়া থাকেন। গিরিশচন্দ্র জানিতে চাহিয়াছিলেন যে, দোষদুষ্টকে দোষমুক্ত করিতে হইলে সেই সকলের চর্চা করিয়া তাহাদের উন্নতিসাধনের পথে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিলে অপরাধ হয় কি-না।

বক্তা ও অভিনেতা যেরূপ আদর পান এরূপ আদর আর কেহ পান না বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু আবার অভিনেতারা যেরূপ নিন্দার ভাজন হন সেরূপও আবার কাহারও অদৃষ্টে ঘটে না। আদর ও অনাদর সমভাবেই চলে। রাজার সহিত একত্র ভোজন, উচ্চপদস্থ ব্যক্তির সহিত সমভাবে ভ্রমণ, একদিকে এত আদর আবার অপরদিকে—অভিনেতার শবদেহের সৎকার-স্থান পাওয়াও কষ্টকর হয়।*

সে যাহাই হউক, গিরিশচন্দ্রের ধারণা ছিল বঙ্গীয় রঙ্গালয় ধীরে ধীরে উন্নতি লাভ করিয়া সমাজের ও দেশবাসীর প্রভূত মঙ্গল সাধন করিবে। অভিনেতার জীবন অতি কষ্টকর—'রজনীর জাগরণ নিত্য হরে প্রাণ'। তিনি ইহাও জানিতেন—'দেহপট সঙ্গে নট সকলই হারায়।' তত্রাচ তিনি বহু উচ্চাশা হৃদয়ে পোষণ করিতেন বলিয়াই রঙ্গভূমিকে ভালবাসিয়াছিলেন এবং নটের জীবন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

'Stone walls do not a prison make,
Nor iron bars a cage,
Minds innocent and cheerful take,
That for a hermitage.'

মহাকবি Milton-এর অমর লেখনী-প্রসূত এই বাণী হইতেই বোধ করি গিরিশচন্দ্র স্বীয় অভীষ্ট-সাধনে অনুপ্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন।

গত শতাব্দীতে যে সব উজ্জ্বল রত্ন জ্যোতিষ্কের ন্যায় দীপ্তিমান্ থাকিয়া বঙ্গমাতার অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য বিকশিত করিয়াছিলেন, নাট্যাচার্য্য গিরিশচন্দ্র তাঁহাদের অন্যতম। বঙ্গীয় ভাষাসাহিত্য-সৃষ্টিতে যেমন—ঈশ্বরচন্দ্র, অক্ষয়কুমার ও বঙ্কিমচন্দ্র; কাব্যে যেমন—মধুসূদন, হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র; গীতিকাব্যে

* ফরাসী দেশের সুবিখ্যাত মনীষী ও নাট্যকার মলিয়েরের জীবিতকালে বহু সম্মান পাওয়া সত্ত্বেও তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার শবদেহের কবরের স্থান পাওয়া যায় নাই।

যেমন—বিহারীলাল, রবীন্দ্রনাথ ও অক্ষয়কুমার; নাট্যসাহিত্যে তেমনই মধুসূদন, দীনবন্ধু ও গিরিশচন্দ্র। অন্যান্য বিভাগেও মহা মহা মনীষাসম্পন্ন মহাত্মাগণের আবির্ভাবে বঙ্গভাষা সালঙ্কৃতা ও নানা শোভা ও সৌন্দর্য্যশালিনী হইয়াছেন।

গিরিশচন্দ্রের নাট্যসাহিত্য-সৃষ্টি বাংলাসাহিত্যের ইতিহাসে এক বিশেষ গৌরবময় ও গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়া আছে। যিনি বাংলার নাট্য-সাহিত্যের চক্রবর্ত্তী-সম্রাট্, যাঁহার নাটকের অভিনয় দর্শন করিয়া ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবাবেশে সমাধিমগ্ন হইয়াছিলেন, স্বামী বিবেকানন্দ শতমুখে যাঁহার নাটকাবলীর প্রশংসা করিয়াছেন, তাঁহার সৃষ্টির উৎকর্ষাপকর্ষ বিচারের ভার গ্রহণ করা গুরুতর দুঃসাহসের কার্য্য সন্দেহ নাই। তত্রাচ সর্ব্বকনিষ্ঠ ভক্ত হিসাবে সুধীজনের সম্মুখে নটগুরু গিরিশচন্দ্রের কথা যৎসামান্য আলোচনা করার এত বড় একটা সুযোগ উপেক্ষা করিতে না পারিয়া এই দুঃসাহসিক কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছি।

গিরিশচন্দ্র ও বাঙ্গালার নাট্যসাহিত্য এবং রঙ্গমঞ্চ অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। নাট্যকার গিরিশচন্দ্রের আলোচনা করিতে গেলে বাঙ্গালার নাট্যসাহিত্য ও নাট্যশালার ক্রমবিবর্ত্তনের ইতিহাস অপরিহার্য্য ভাবেই আসিয়া পড়ে। সুতরাং আমরা এখানে নাটক ও নাট্যশালার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের কিঞ্চিৎ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

সংস্কৃত নাটক ও তাহার অভিনয় সম্বন্ধে আলোচনা আমাদের বিষয়বস্তু নহে। আমরা বাংলা নাটক ও তাহার অভিনয়াদি সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা করিয়া গৈরিশ নাট্যসাহিত্য সম্বন্ধে যথাসাধ্য আলোচনার চেষ্টা করিব।

বাংলা নাটকের উৎপত্তি সম্বন্ধে যতদূর জানা যায় তাহাতে দেখা গিয়াছে, মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের সময়ে বাংলাদেশে বঙ্গভাষায় নাটকাভিনয়ের প্রচলন ছিল। শ্রীচৈতন্যদেব স্বয়ং নাটকাভিনয়ে অংশ গ্রহণ করিতেন এবং কৃষ্ণলীলা ও শক্তিলীলা উভয়প্রকার অভিনয়েই অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। মহাপ্রভুর সহচরবৃন্দ ও ভক্ত সাধারণ ঐ সকল অভিনয়দর্শনে আনন্দলাভ করিতেন।

বাংলা নাটকের উৎপত্তির কথা

প্রকৃতপক্ষে দেখা যায়, শ্রীচৈতন্যের সময় হইতেই বাংলাভাষার উন্নতির পথ প্রসারিত হয়। বৈষ্ণব কবিগণ কাব্য ও গীত রচনা করিয়া ভাষার সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করেন এবং অনুমান করা যায়, এই সময় হইতেই বাংলাভাষায় নাটক রচনার চেষ্টা চলিতে থাকে। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে রচিত কতকগুলি নাটকের

উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। সেই সকল নাটকের মধ্যে লোচনদাসের 'জগন্নাথবল্লভ', যদুনন্দন দাসের 'বিদগ্ধমাধব' বা 'রাধাকৃষ্ণলীলা-কদম্ব' এবং প্রেমদাসের 'চৈতন্য-চন্দ্রোদয়-কৌমুদী' উল্লেখযোগ্য।

বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় প্রাচীনকাল হইতেই রামায়ণ-গান, কথকতা, পাঁচালী ও যাত্রাভিনয় একে একে সম্প্রসারিত হইতে থাকে। যাত্রাওয়ালারা পালার আকারে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নাটক রচনা করিতেন, যাহাতে গদ্য বা বক্তৃতার অংশ অতি সামান্যই থাকিত। বেশীর ভাগ সঙ্গীতেই পরিপূর্ণ। এই সকল যাত্রাভিনয়ে লোকে বেশী আনন্দলাভ করিত এবং ক্রমশঃ যাত্রার আদর বাড়িয়া যাইতে লাগিল। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিক হইতে বঙ্গভাষায় লিখিত নাটকের প্রচলন হয়। ১৮২১ খৃষ্টাব্দে 'কলিরাজার যাত্রা' নাটকের অভিনয় হয়। এই অভিনয়ের পূর্ব্বে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইংরাজ রাজপুরুষগণ 'কলিকাতা থিয়েটার' নামে সহরে এক নাট্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করেন এবং নিজেরা অভিনয় করিতেন। 'কলিরাজার যাত্রা' নাটক অভিনয়ের সমালোচনা রাজা রামমোহন রায়ের 'সংবাদকৌমুদী' নামক পত্রে প্রকাশিত হয়; এবং Calcutta Review (vol. xiii 1850, পৃঃ ১৬০) হইতেও জানা যায় যে, ১৮২১ খৃষ্টাব্দে 'কলিরাজার যাত্রা' নাটক অভিনীত হইয়াছিল। 'কলিকাতা রিভিউ'-এ প্রদত্ত সংবাদকৌমুদীর বিবরণ হইতে জানা যায় যে, ঐ পত্রের ৫ম সংখ্যায় 'অধুনা প্রচলিত নাটকগুলির দূষিত রুচির আলোচনা' শীর্ষক প্রবন্ধ কয়েকখানি নাটকের অস্তিত্বের সাক্ষ্য দিতেছে। কিন্তু এই নাটকগুলির নাম, রচয়িতার নাম বা এই নাটকগুলি কখনও অভিনীত হইয়াছিল কি-না, বা এইগুলি ইংরাজীর অনুকরণে লিখিত কি-না—কিছুই জানা যায় না। 'কলিরাজার যাত্রা' এই নামকরণ হইতেই বুঝা যায় ইহা ইংরাজীর অনুকরণ নহে।

প্রাক্ গৈরিশ যুগে বাংলা নাটক ও অভিনয়

—বিদ্যাসুন্দর অভিনয়—

প্রায় দশ বৎসর পরে ১৮৩১ খৃঃ (বঙ্গাব্দ ১২৩৭) কোজাগর-পূর্ণিমা রজনীতে কলিকাতায় বাঙালীর দ্বারা প্রথম বাংলা নাটকাভিনয় হয়। কলিকাতা বাগবাজারস্থ স্বর্গীয় নবীনচন্দ্র বসু বিপুল অর্থব্যয় করিয়া তাঁহার বৃহদায়তন বাসস্থানে (এই বাটীর চিহ্নমাত্র নাই—শ্যামবাজারের মোড়ের দিকে কৃষ্ণরাম

বসুর গলিতে প্রবেশ করিয়াই বর্ত্তমান ট্রাম ডিপো ও তৎসংলগ্ন ভূমিতে নবীন-বাবুর সুবিশাল অট্টালিকা ছিল) 'বিদ্যাসুন্দর' নাটকের অভিনয়ের আয়োজন করেন। এই অভিনয়ে নাটকোক্ত দৃশ্যাবলী বাটীর নানাস্থানে প্রকৃত সাজ-সজ্জাদির দ্বারা সাজান হয়। এক গৃহ হইতে অন্য গৃহে মৃত্তিকা খনন করিয়া সুড়ঙ্গ প্রস্তুত করা হইয়াছিল। বকুলতলার পুষ্করিণীর দৃশ্য অট্টালিকাসংলগ্ন উদ্যানস্থ পুষ্করিণী তীরে সজ্জিত হইয়াছিল। বীরসিংহের দরবার কক্ষ হইয়াছিল নবীনবাবুর সুবৃহৎ বৈঠকখানা এবং উদ্যানের এক পার্শ্বে মালিনীর কুটির ও মালঞ্চ সজ্জিত ছিল। একস্থানের এক দৃশ্যের অভিনয় দেখিয়া অন্য দৃশ্য দেখিতে স্থানান্তরে যাইতে হইয়াছিল। স্ত্রী-অভিনেত্রীগণের ভূমিকাগুলি স্ত্রীলোকদের দ্বারা অভিনীত হইয়াছিল। মধুসূদনের জীবনীকার যোগীন্দ্রনাথ বসুর মতে এই অভিনয় সম্পূর্ণ নাটকোচিত না হইলেও দৃশ্যপটের সমাবেশ, কৃত্রিম সুড়ঙ্গ খনন এবং পুরুষ-অভিনেতা ও নারী-অভিনেত্রীগণের একত্র সমাবেশ ইত্যাদির জন্য ইহাকে বঙ্গদেশের প্রথম নাটকাভিনয় বলা যাইতে পারে। এই অভিনয়ের সহিত উত্তর-পশ্চিম ভারতে প্রচলিত 'রামলীলা' অভিনয়ের একটা সাদৃশ্য অনুভব করা যায়। এই নাট্যসম্প্রদায়টি প্রায় চার-পাঁচ বৎসর জীবিত ছিল; কিন্তু 'বিদ্যাসুন্দর' ব্যতীত অন্য নাটকের অভিনয় হইয়াছিল কি-না তাহা জানা যায় না। ১৮৩৫ খৃঃ (১২৪১ বঙ্গাব্দ) হিন্দু পাইয়োনিয়র পত্রের অক্টোবর সংখ্যা হইতে জানা যায় তখনও 'বিদ্যাসুন্দর' অভিনয় হইতেছে এবং অভিনয়ের জন্য রঙ্গমঞ্চ ও ঐকতান বাদনের ব্যবস্থা হইয়াছিল এইরূপও শুনা যায়।*

'বিদ্যাসুন্দর' নাটকাভিনয়ের পর ১৮৫২।৫৩ খৃঃ পর্য্যন্ত সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে কোন বাংলা নাটকের উদ্ভব বা অভিনয় হইয়াছিল কি-না, সে সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না।

১৮৩২ খৃঃ কলিকাতাস্থ প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী রাজা প্রসন্নকুমার ঠাকুর 'হিন্দু থিয়েটার' নামে তাঁহার শুঁড়ার বাগানে একটি নাট্যসম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করেন।

* এই অভিনয়ের বিবরণ হইতে জানা যায় (১) ঐকতান-সম্প্রদায়ের দ্বারা যন্ত্রসঙ্গীত দেশীয় অভিনয়ে সংযোজিত হইয়াছিল; তন্মধ্যে বেহালাবাদক ব্রজনাথ গোস্বামী উচ্চ প্রশংসা পান। আর ঐ অভিনয়ে বরাহনগর নিবাসী শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সুন্দরের ভূমিকায় অভিনয় করেন। (২) স্ত্রী-ভূমিকাগুলি স্ত্রীলোকদের দ্বারাই অভিনীত হয়; যথা—বিদ্যা—রাধামণি বামনী, রাণী ও মালিনী—জয় দুর্গা, সহচরীর ভূমিকা—রাজকুমারী বা রাজু।

সেই থিয়েটারে সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ডক্টর হোরেস হেম্যান উইলসন-কর্ত্তৃক সংস্কৃত 'উত্তররাম-চরিতম্' নাটকের ইংরাজী অনুবাদ অভিনীত হয় এবং হিন্দু কলেজের অধ্যাপক ও ছাত্রগণ মিলিত হইয়া এই অভিনয় করেন। পরে শেক্সপীয়ারের 'জুলিয়স্ সীজার' নাটকের অংশবিশেষও অভিনীত হয়। এতদ্ব্যতীত ওরিয়েণ্টাল সেমিনারী ও মেট্রোপলিটান একাডেমী প্রভৃতি বিদ্যায়তনে এবং প্যারীমোহন বসু (পূর্ব্বোক্ত নবীনচাঁদ বসুর ভ্রাতুষ্পুত্র) প্রমুখ ধনিগৃহে ইংরাজী নাটকের অভিনয় হয়। প্যারীমোহন বসু মহাশয়ের গৃহে 'জুলিয়স্ সীজার' নাটকাভিনয়ে সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা মহেন্দ্রলাল বসুর পিতা ব্রজনাথ বসু অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীতে 'ওরিয়েণ্টাল থিয়েটারে'র নাট্যকলাবিশারদগণের শিক্ষাধীনে ছাত্রগণ শেক্সপিয়ারের 'মার্চের্চণ্ট অব ভিনিস্,' 'ওথেলো,' 'হেনরী দি ফোর্থ' প্রভৃতি নাটকের অভিনয় করেন। এই ছাত্র-সম্প্রদায়ের মধ্যে বঙ্গের প্রথম নটগুরু কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় অন্যতম।

বাঙ্গালীগণ-কর্ত্তৃক ইংরাজী নাটকাভিনয়

এই সকল ইংরাজী নাটকাভিনয়ের কালে ১৮৫২।৫৩ খৃঃ বা ১২৫৯।৬০ বঙ্গাব্দে তারাচরণ শিকদার 'ভদ্রার্জুন' নামে একখানি নাটক রচনা করেন। এই নাটকখানি অভিনীত হয় নাই। মেট্‌কাফ হল লাইব্রেরীতে (বর্ত্তমানে ন্যাশনাল লাইব্রেরী) এই নাটকখানি আছে।

তারাচরণ শিকদারের 'ভদ্রার্জুন'

১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে কবিকেশরী রামনারায়ণ তর্করত্ন (নাটুকে নারাণ) মহাশয়ের সুবিখ্যাত 'কুলীন-কুল-সর্ব্বস্ব' নাটক প্রকাশিত হয়। 'কলিরাজার যাত্রা' ও 'ভদ্রার্জুন' তত আদরের নাটক হয় নাই। সেইজন্য এই 'কুলীন-কুল-সর্ব্বস্ব' সেই সময়ের ভাল নাটক হিসাবে বিশেষ সমাদৃত হয় এবং রামনারায়ণ তর্করত্ন মহাশয়কে সেইজন্য কেহ কেহ রঙ্গালয়ের প্রথম নাটককার বলিয়া ঘোষণা করেন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে চড়কডাঙ্গার জয়রাম বসাকের বাটীতে এই নাটক সর্ব্বপ্রথম অভিনীত হয়।*

রামনারায়ণ তর্করত্ন বাংলাভাষায় 'কুলীন-কুল-সর্ব্বস্ব,' 'রত্নাবলী,' 'বেণী-সংহার,' 'শকুন্তলা, ''নবনাটক,' 'মালতীমাধব', 'রুক্মিণীহরণ,' 'স্বপ্নধন,'

* উক্ত নাটকের অভিনয়ে পরবর্ত্তী কালের রয়েল বেঙ্গল থিয়েটারের অধ্যক্ষ ও নাট্যকার বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। উক্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বৈতনিক অভিনেতাগণের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম।

'ধর্ম্মবিজয়,' 'কংসবধ', ও 'ধনুর্ভঙ্গ' (অপ্রকাশিত) প্রভৃতি নাটক ও 'যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল', 'উভয় সঙ্কট' ও 'চক্ষুদান' নামক কয়েকখানি প্রহসন রচনা করেন। তাঁহার রচিত কয়েকখানি নাটক পারিতোষিক প্রাপ্ত হইয়া সবিশেষ আদর পায় ও বহু নাট্যসম্প্রদায়-কর্ত্তৃক অভিনীত হয়। 'রঙ্গপুর বার্ত্তাবহে' প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি অনুসারে 'কুলীন-কুল-সর্ব্বস্ব' নাটক রচনা করিয়া তিনি রঙ্গপুর কুণ্ডীর বদান্য জমিদার কালীচন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয় প্রদত্ত ৫০ টাকার পারিতোষিক লাভ করিয়াছিলেন।

এই অভিনয়ের সমসাময়িক অর্থাৎ ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দেই সিমুলিয়ার স্বর্গীয় রামদুলাল সরকার মহাশয়ের বাটীতে তদীয় পুত্র আশুতোষ দেব মহাশয়ের উদ্যোগে মহাসমারোহে বিপুল অর্থব্যয়ে কালিদাসের 'শকুন্তলা' ভাষান্তরিত হইয়া অভিনীত হয়। এই আশুতোষ-বাবু, ওরফে ছাতুবাবুর বাটীর অভিনয়ই তখনকার কালের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের দৃষ্টি নাট্যাভিনয়ের প্রতি আকর্ষণ করে।

'শকুন্তলা' অভিনয় (১ম)

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দেই জোড়াসাঁকোর প্রথিতনামা কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়ের ভবনে তাঁহার নিজের যত্নে ও আগ্রহে 'বেণীসংহার' নাটক অভিনীত হয়। বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশিত নাটকাবলীর সংখ্যা অতি অল্প দেখিয়াই পণ্ডিতমণ্ডলীর সাহায্যে কালীপ্রসন্নবাবু স্বয়ং নাটক রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার অনূদিত প্রথম বাংলা নাটক 'বিক্রমোর্ব্বশী'। পরে 'মালতীমাধব'ও অনুবাদ করেন। 'বেণীসংহার' নাট্যাভিনয়ের আটমাস পরে সিংহ মহাশয়ের অনূদিত 'বিক্রমোর্ব্বশী' অভিনীত হয়।*

'বেণীসংহার' ও 'বিক্রমোর্ব্বশী'

১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে ৩১শে জুলাই পাইকপাড়ার সুবিখ্যাত ভূম্যধিকারী রাজা প্রতাপনারায়ণ সিংহ ও রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ মহোদয়গণের উদ্যোগে তাঁহা-দিগের বেলগাছিয়া বাগানবাটীতে 'রত্নাবলী' নাটকের অভিনয় হয়। বৈদেশিক দর্শকগণের জন্য 'রত্নাবলী'র এক ইংরাজী অনুবাদ মুদ্রিত করা হয়। ইহার অনুবাদক ছিলেন অমর কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত। পারিতোষিক হিসাবে রাজ-ভ্রাতৃদ্বয় মধুসূদনকে পাঁচশত টাকা দান করেন। এই নাট্যসম্প্রদায়ের নাট্যাচার্য্য

রামনারায়ণের 'রত্নাবলী'

* 'বেণীসংহার' ও 'বিক্রমোর্ব্বশী' নাটকদ্বয়ে সিংহ মহাশয়ের নামের সঙ্গে সঙ্গে অন্যতম অভিনেতা রূপে ভারতবিখ্যাত ব্যবহারজীবি-কুলশেখর উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (W. C. Banerjee) মহাশয়ের নাম উল্লেখযোগ্য।

ছিলেন—বাগবাজার-নিবাসী নটকুলচূড়ামণি কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি স্বয়ং 'বসন্তকে'র ভূমিকা গ্রহণ করেন। রাজভ্রাতৃদ্বয়ও এই অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

'রত্নাবলী'র মত একখানি নাটকের অভিনয়ে এত জাঁকজমক ও বিপুল অর্থব্যয় মধুসূদনের মনঃপূত না হওয়ায় তিনি উচ্চ আদর্শের বাংলা নাটক রচনার সঙ্কল্প করেন; এবং ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বরে উক্ত পাইকপাড়া নাট্য-সম্প্রদায়ের যত্নে ঐ স্থানেই মধুসূদনের প্রথম নাটক 'শর্ম্মিষ্ঠা' অভিনীত হয়।

মাইকেল মধুসূদনের 'শর্ম্মিষ্ঠা'

'শর্ম্মিষ্ঠা' অভিনয়ের সমসাময়িক আর এক অভিনয়ের আয়োজনের কথা আমরা জানিতে পারি। স্বর্গীয় আচার্য্য কেশবচন্দ্র সেনের যত্নে সিন্দুরিয়াপটী নামক কলিকাতার বড়বাজার পল্লীতে 'বিধবাবিবাহ' নাটকের এক অভিনয় অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম অভিনয় হয় ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে। আচার্য্য কেশব সেনই স্বয়ং নাট্য-শিক্ষক। এই অভিনয়ে চারি হাজার টাকা নাকি ব্যয় হয়। হলবিং নামক জনৈক ইংরাজ নাট্যপীঠ-শিল্পীদ্বারা মঞ্চ ও দৃশ্যপটাদি প্রস্তুত হইয়াছিল। তখনকার 'হরকরা' পত্রে ইহার কিছু কিছু আলোচনা আছে।

সিন্দুরিয়াপটীর 'বিধবাবিবাহ'

সিন্দুরিয়াপটীর গোপাললাল মল্লিকের বাটীর অভিনয়ের ৩।৪ বৎসর পরে অর্থাৎ ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার সুবিখ্যাত ভূম্যধিকারী, শোভাবাজার রাজ-বাটীর দেবীকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের ভবনে Sovabazar Private Theatrical Society নামে এক নাট্যসম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা হয়। এই সম্প্রদায়ের প্রথম অভিনীত নাটক বা প্রহসন মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'একেই কি বলে সভ্যতা'। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের ২৪শে জুলাই এই সম্প্রদায়-কর্ত্তৃক মাইকেলের 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকের প্রথম অভিনয় হয় এবং সমিতি পুনর্গঠিত হওয়ায় পুনরায় ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে মহাসমারোহে উক্ত 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকের এক অভিনয় হয়। 'হিন্দু পেট্রিয়ট্' নামক সাময়িক পত্রে এই সকল অভিনয়ের বহু বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে।

শোভাবাজার প্রাইভেট থিয়েট্রিক্যাল সোসাইটি-কর্ত্তৃক 'একেই কি বলে সভ্যতা' ও 'কৃষ্ণকুমারী' অভিনয়

রাজবাটীর এই অভিনয়ে বঙ্গের স্থায়ী নাট্যশালার ভাস্কর, নটকুল-ধুরন্ধর, শ্রেষ্ঠ নাট্যকার ও নাট্যাচার্য্য গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় দর্শকরূপে উপস্থিত

ছিলেন। এই সময়ে দুই-এক স্থল ব্যতীত সংস্কৃত হইতে ভাষান্তরিত বাংলা নাটক অপেক্ষা খাঁটি বাংলা নাটকের অভিনয়ের আদর দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। কবিবর মাইকেল মধুসূদনের নাটক ও প্রহসনাদি অধিকাংশ স্থলেই অভিনীত হইত।

বাগবাজারের দলের অভিনয় 'নল-দময়ন্তী' ও 'ইন্দুপ্রভা'

১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে বাগবাজারে নীলমণি চক্রবর্ত্তীর বাটীতে এক নাট্যসম্প্রদায় গঠিত হয়। ইহারা প্রথম দুই বৎসর কালিদাস সান্যাল মহাশয়ের রচিত 'নল-দময়ন্তী' নাটক অভিনয় করেন। অভিনয়-কলার প্রসার বৃদ্ধিকল্পে এই সম্প্রদায় দেশে-বিদেশে অভিনয় দেখাইয়া বেড়াইতেন। চটা মহেশতলা নিবাসী গিরিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'ইন্দুপ্রভা' নামক আর একখানি নাটক এই সম্প্রদায়-কর্ত্তৃক অভিনীত হইয়াছিল।

পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুর-বাড়ীর নাট্যসম্প্রদায়

১৮৬৩।৬৪ খৃষ্টাব্দে পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুরবাড়ীতে মহারাজা যতীন্দ্র-মোহন ঠাকুরের প্রযত্নে এক উৎকৃষ্ট নাট্যসম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠার কথা প্রকাশিত আছে। এই সম্প্রদায় 'মালবিকাগ্নিমিত্র' নাটক লইয়া প্রথম রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হন। পরে ২।৩ বৎসর কাল ধরিয়া তাঁহারা 'বিদ্যাসুন্দর', 'যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল', 'বুঝলে কি না', 'মালতী-মাধব', 'উভয় সঙ্কট', 'চক্ষুদান', 'রুক্মিণী-হরণ' ইত্যাদি অভিনয় করিতে থাকেন। বহুকাল পরে আবার ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে কিছুদিনের জন্য তাঁহারা 'রসাবিষ্কার বৃন্দক' নামক এক ক্ষুদ্র দৃশ্যকাব্যের অভিনয় করিয়াছিলেন।

পাথুরিয়াঘাটার এই সুবিখ্যাত নাট্যসম্প্রদায়ের বহুবর্ষব্যাপী জীবন-কালের মধ্যে কলিকাতার ও অন্যান্য স্থানে অনেকগুলি নাট্যাভিনয়ের কথা সংক্ষেপে কিছু কিছু প্রদত্ত হইল।

ভবানীপুর অবৈতনিক নাট্য-মন্দির—'সীতার বনবাস'

১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে মার্চ্চ মাসে ভবানীপুরে রমেশচন্দ্র মিত্র মহাশয়দের পুরাতন বাটীতে অবৈতনিক নাট্যমন্দির উমেশচন্দ্র মিত্র রচিত 'সীতার-বনবাস' নামক এক নাটকের অভিনয় করেন।

'আড়পুলি নাট্যসমাজ'

উক্ত বৎসরের এপ্রিল মাসে পটলডাঙ্গার 'আড়পুলি নাট্যসমাজ' নামধেয় এক সম্প্রদায় 'মহাশ্বেতা' নামক নাটকের অভিনয় করেন এবং ক্রমান্বয়ে ইঁহারা 'শকুন্তলা', 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ', 'চন্দ্রাবলী' ও 'এঁরাই আবার বড় লোক' নামক নাটক ও প্রহসনাদির

অভিনয় করেন। 'চন্দ্রাবলী' নাটকের রচয়িতা বাবু নিমাইচরণ শীল। 'শকুন্তলা' ও 'মহাশ্বেতা' নাটক দুইখানি সিমুলিয়ার আশুতোষবাবুর বাড়ীতে অভিনীত 'শকুন্তলা' ও 'মহাশ্বেতা' নামক নাটকদ্বয় হইতে পৃথক্। কথিত আছে, এই সম্প্রদায়ের জনৈক সদস্য ঐগুলির রচয়িতা।

১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে সিমুলিয়া শুঁড়িপাড়ার সাহাবাবুদের বাটীতে মাইকেল মধুসূদনের 'পদ্মাবতী' নামক নাটকখানি অভিনীত হয়।

'পদ্মাবতী'

১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে বটতলার জয়চন্দ্র মিত্র মহাশয়ের বাটীতে তদীয় পুত্র পঞ্চানন মিত্রের উদ্যোগে মধুসূদনের 'পদ্মাবতী' নাটকের পুনরভিনয় হয়, কারণ, এ-যুগে 'পদ্মাবতী' নাটকখানি বিশেষ সমাদর লাভ করে।

১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যমাংশে জোড়াসাঁকোর স্বনামখ্যাত ভূম্যধিকারী প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর মহাশয়ের ভবনে তদীয় পৌত্রদ্বয় গণেন্দ্রনাথ ও গুণেন্দ্রনাথের উদ্যোগে 'জোড়াসাঁকো অবৈতনিক নাট্যসমাজ' নামে এক বিশিষ্ট নাট্য-সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত হয়। কোনও নূতন নাটকের অভিনয়প্রয়াসী হইয়া ইঁহারা

রামনারায়ণের 'নবনাটক'

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরামর্শে দুইশত টাকা পুরস্কার ঘোষণা করিয়া 'নবনাটক' নামক এক নূতন নাটকের পাণ্ডুলিপি উৎকৃষ্ট বিবেচিত হওয়ায় তাহা গ্রহণ করেন। এই নাটকের রচয়িতা রামনারায়ণ তর্করত্ন। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে এই নাটকের প্রথম অভিনয় হয়। মহর্ষির পুত্র জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং ভ্রাতুষ্পুত্রদ্বয় গণেন্দ্রনাথ ও গুণেন্দ্রনাথ এবং বাবু অক্ষয়কুমার মজুমদার, পণ্ডিত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ ও বাবু নীলকমল মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি অভিনয় করেন।

এই সময়ে কলিকাতার নানাস্থানে ও সহরতলীতে পুরাতন ও নূতন নানা নাটকের অভিনয় হইতেছিল। তবে এ সকল নাট্যসম্প্রদায়ের কোনটিই স্থায়ী

ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ের রচিত 'কিছু কিছু বুঝি'

আকার ধারণ করে নাই। মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহাশয়ের বাড়ীতে অভিনীত 'বুঝলে কি না' নাটকের প্রতি কটাক্ষ করিয়া কয়লাহাটার হেমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের বাটীতে তাৎকালিক প্রহসন লেখক ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় রচিত 'কিছু কিছু বুঝি' নামক প্রহসনখানির অভিনয় হয়। স্থায়ী রঙ্গমঞ্চের প্রথম পীঠশিল্পী ধর্ম্মদাস সুর ও নটকুলশেখর অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী ইহাতে ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

মাইকেলের 'উষা-অনিরুদ্ধ'

'চোরবাগান এমেচার থিয়েটার' নামে এক নাট্যসম্প্রদায়-কর্ত্তৃক বাবু কানাই লাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাটীতে 'উষা-অনিরুদ্ধ' নাটকখানি অভিনীত হয়।

মনোমোহন বসুর 'সতী', 'রামাভিষেক' ও 'প্রণয়-পরীক্ষা' প্রভৃতি

ওদিকে বহুবাজার অঞ্চলে গঠিত এক নাট্যসম্প্রদায়-কর্ত্তৃক কবি মনোমোহন বসু মহাশয়ের রচিত 'সতী' ও 'রামাভিষেক' অভিনীত হয়। মনোমোহন বাবুর 'প্রণয়পরীক্ষা' প্রভৃতি অন্যান্য নাটকও সাধারণের মনোরঞ্জন করিয়াছিল।

গিরিশ-পূর্ব্বযুগের নাটকাবলীর উপরিউক্ত বিবরণ হইতে দেখা যায়, সে-যুগের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার ছিলেন রামনারায়ণ ও মধুসূদন; উভয় নাট্যকারের রচনার আদর্শ ভিন্ন ভিন্ন কিন্তু স্বমহিমায় সমুজ্জ্বল। রামনারায়ণ ও মধুসূদনের পরবর্ত্তী শ্রেষ্ঠ নাট্যকার রায় দীনবন্ধু মিত্র। মনোমোহন বসু দীনবন্ধু মিত্রের পূর্ব্ববর্ত্তী হইলেও নাট্যজগতে রামনারায়ণ, মধুসূদন ও দীনবন্ধু যতখানি প্রভাব বিস্তার করিতে পারিয়াছিলেন, মনোমোহন বসু ততখানি পারেন নাই। দীনবন্ধু মিত্রের নাটকাবলীর সহিত বঙ্গীয় নাট্যশালার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। তাঁহার নাটকের অভিনয়ে যে সম্প্রদায় অগ্রণী তাহার ইতিহাস কথার সহিতও বঙ্গীয় স্থায়ী নাট্যশালা চিরজড়িত।

কলিকাতার নাট্য আলোচনার স্রোত যখন পাইকপাড়া, জোড়াসাঁকো, সিমুলিয়া, পাথুরিয়াঘাটা প্রভৃতি স্থানের অভিজাত-সম্প্রদায়ের আদর্শ গ্রহণ করিয়া সতেজে বহিতেছিল, তখন আবার বঙ্গীয় সৎনাট্যসাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহার বিপরীত দিকগামী কয়েকটি হীনাদর্শ নাট্যের আলোচনায় তাহার সমধিক ক্ষতি হইতে লাগিল। আক্ষেপের বিষয় এই যে, এই জাতীয় প্রহসনের একখানি কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি-কর্ত্তৃক পৃষ্ঠপোষিত হইয়া অভিনীত হইয়াছিল। আমাদের পূর্ব্বকথিত 'কিছু কিছু বুঝি' নামক প্রহসনখানি এই শ্রেণীর রচনা।

যখন কোনও কোনও সম্প্রদায় বঙ্গীয় নাট্যসাহিত্যের ও তৎ তৎ অভিনয়ের শ্রাদ্ধ করিতেছিলেন, তখন আবার কয়েকটি গীতাভিনয়-সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া অপরদিকে সৎসাহিত্যের আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে সৎনাট্যের অভিনয়ে দেশের এই নবকলাবিদ্যার সুপ্রতিষ্ঠার জন্য বিশেষভাবে সাহায্য করিতেছিলেন।

বহুবাজারস্থ অবৈতনিক নাট্যসম্প্রদায়—যাঁহারা মনোমোহন বাবুর নাটক অভিনয় করিতেছিলেন—ইঁহাদের অন্যতম। এই সময়ে বাগবাজারে

দুই-তিন বার পর পর 'শর্ম্মিষ্ঠা', 'উষা-অনিরুদ্ধ' বা 'উষা-হরণ' ও 'রত্নাবলী' অভিনীত হয়। শ্যামপুকুরে 'শকুন্তলা' কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত ও পরে হাবড়া-বঁ্যাটরায় 'প্রভাবতী' (Shakespeare-এর Merchant of Venice অবলম্বনে) প্রভৃতি নাটকাবলী অভিনীত হইয়াছিল। এই সকল গীতাভিনয়ানুষ্ঠানে উল্লিখিত অশ্লীল নাট্যাভিনয়ের স্রোত ক্রমে ক্রমে মন্দীভূত হইতে থাকে।

বাগবাজারের গীতাভিনয়-সম্প্রদায় যাঁহারা পরবর্ত্তীকালে বাগবাজার এমেচার থিয়েটার নাম ধারণ করিয়া দীনবন্ধুর 'সধবার একাদশী' নাটকখানি মঞ্চস্থ করিয়া দশ কমণ্ডলীর মধ্যে এক অভূতপূর্ব্ব নাট্যরসস্পৃহা জাগাইয়া তুলিলেন এবং পরে বাঙ্গালার স্থায়ী নাট্যশালার অগ্রদূতরূপে যাঁহারা ন্যাশনাল থিয়েটার আখ্যা লইয়া (পেশাদারী) বৈতনিক-সম্প্রদায়ে পরিণত হইয়াছিলেন, গিরিশচন্দ্র ছিলেন সেই দলেরই একজন বিশিষ্ট সভ্য ও অভিনয়াদির প্রযোজক। ইঁহারা প্রধানতঃ রায় দীনবন্ধু মিত্র ও মাইকেল মধুসূদন দত্তের নাটকই অভিনয় করিতেন। অবৈতনিক-সম্প্রদায়রূপে ইঁহারা 'সধবার একাদশী' ও তৎসঙ্গে 'বিয়ে পাগলা বুড়ো' পরে 'লীলাবতী' এবং তৎপরে 'নীলদর্পণের' মহড়া চলিবার কালে উক্ত দলটিকে বৈতনিক দলরূপে গড়িয়া তুলিবার প্রস্তাব করেন। উক্ত প্রস্তাবে সম্মত হইতে না পারিয়া গিরিশবাবু কয়েকমাসের জন্য সম্প্রদায় পরিত্যাগ করেন। ইতোমধ্যে সুবিখ্যাত অভিনেতা মতিলাল সুর ও হিন্দুমেলার সুবিখ্যাত বাবু নবগোপাল মিত্র (যিনি 'ন্যাশনাল নবগোপাল' নামে খ্যাত ছিলেন) মহাশয়ের প্রস্তাবে সম্প্রদায়ের নাম 'ন্যাশনাল থিয়েটার' রাখা হইয়াছিল।

১৮৭২ খৃষ্টাব্দে ৭ই ডিসেম্বর ন্যাশনাল থিয়েটার বৈতনিক-সম্প্রদায়রূপে জোড়াসাঁকো মধুসূদন সান্যালের বাড়ীতে প্রথম 'নীলদর্পণ' মঞ্চস্থ করেন। গিরিশচন্দ্র তখন উক্ত দলের সহিত সম্পর্ক ত্যাগ করিয়াছেন। 'নীলদর্পণে'র পর এই বৈতনিক দল দীনবন্ধু মিত্রের অন্য দুইখানি নাটক 'জামাই বারিক' ও 'নবীন তপস্বিনী' মঞ্চস্থ করেন। এই নাটকাভিনয়ের সহিত মাঝে মাঝে 'মুস্তাফি সাহেব কা পাক্কা তামাসা' আরব্য উপন্যাস হইতে গৃহীত ও ধর্ম্মদাস সুর রচিত 'কুব্জ ও দর্জি' নামক প্রহসনগুলি অভিনীত হইত।

এই সময়ে বাবু শিশিরকুমার ঘোষ 'ভারতমাতা' নামে একখানি নাটক অভিনয়ের জন্য প্রদান করেন; উহা অতি সমারোহে অভিনীত হয়। এইরূপ কয়েকখানি নাটক অভিনীত হইবার পব নগেন্দ্রবাবু ও অর্দ্ধেন্দুবাবু মাইকেলের 'কৃষ্ণকুমারী' নাটক অভিনয়ের সঙ্কল্প করেন। তখন সম্প্রদায়ের নেতৃবর্গের

অনুরোধে গিরিশবাবু আসিয়া দলে যোগ দিলেন এবং a distinguished amateur রূপে ভীমসিংহের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইলেন। তখন ন্যাশনাল থিয়েটারের যশ চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িল।

'কৃষ্ণকুমারী' অভিনয়ের সময় হইতে থিয়েটারের আয় লইয়া সম্প্রদায়স্থ সভ্যগণের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিল। নগেন্দ্রবাবু, অর্দ্ধেন্দুবাবু ও অমৃতবাবু আলাদা হইয়া গিয়া 'হিন্দু ন্যাশনাল থিয়েটার' নামে এক দল গঠন করেন। এদিকে গিরিশবাবুর অধ্যক্ষতায় ন্যাশনাল থিয়েটার স্থান পরিবর্ত্তন করিয়া ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসের শেষে শোভাবাজার রাজবাটীতে নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা' মঞ্চস্থ করেন। অপরপক্ষে অর্দ্ধেন্দুবাবুর দল 'অপেরা হাউস' ভাড়া লইয়া অভিনয় করিতে থাকেন।

শোভাবাজারে ন্যাশনাল থিয়েটার স্থানান্তরিত করার আয়োজনের সময়ই Dr. Macnamare Native Hospital-এর সাহায্যার্থে Town Hall-এ 'নীলদর্পণ' নাটকের অনুষ্ঠান হয়। এবং টিকিট বিক্রয়ের টাকা হইতে সমস্ত খরচ-খরচা বাদে ৭০০৲ টাকা সাহেবের হাসপাতালের জন্য প্রদত্ত হয়। ইহার পরবর্ত্তী শনিবারে ইহারা পুনরায় স্বাধীনভাবে Town Hall ভাড়া লইয়া 'নীলদর্পণে'র অভিনয় করিয়াছিলেন; কিন্তু পূর্ব্ববৎ অর্থাগম হয় নাই। এই অভিনয়ে অধ্যক্ষ গিরিশচন্দ্র অত্যন্ত দক্ষতার সহিত I. I. Wood-এর ভূমিকা অভিনয় করেন এবং অনেকেই তাঁহাকে ইংরাজ বলিয়া ভ্রম করিয়াছিল। Town Hall-এর অভিনয়ের বৈশিষ্ট্য এই যে, এই সকল অভিনয়ে এত দর্শক-সমাবেশ হইয়াছিল যে, ইতঃপূর্ব্বে বাংলা নাটকের অভিনয়ে এত দর্শক কেহ কল্পনা করিতেও পারে নাই; এবং বহু ইংরাজ দর্শক সর্ব্বপ্রথম টিকিট কিনিয়া বাংলা নাটকের অভিনয় দর্শন করিতে আসেন।

শোভাবাজার রাজবাটীতে আসিয়া ন্যাশনাল থিয়েটার বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা' নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত করিয়া অভিনয় করিলেন। উপন্যাস এই প্রথম নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত হইয়া রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইল। শোভাবাজারে আরও দুই-তিনটি অভিনয় হইয়াছিল, তাহার মধ্যে মধুসূদনের 'কৃষ্ণকুমারীর' অভিনয়ই উল্লেখযোগ্য।

'কপালকুণ্ডলা'

১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে Bengal Theatre নামে একটি নাট্যসম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। আশুতোষ দেবের (ছাতুবাবু) দৌহিত্র শরতচন্দ্র ঘোষ মহাশয় ছিলেন ইহার প্রতিষ্ঠাতা। ইঁহারাই প্রথম স্ত্রী-অভিনেত্রী লইয়া অভিনয় আরম্ভ করেন। এই দলের অধ্যক্ষ ছিলেন সুপটু অভিনেতা ও নাট্যকার বিহারীলাল

চট্টোপাধ্যায়। তাঁহার রচিত নাটকাদি, নটকবি রাজকৃষ্ণ রায়ের নাটকাদি এবং মনীষী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'অশ্রুমতি' প্রভৃতি নাটকগুলি এখানে অভিনীত হইত। স্থায়ী রঙ্গমঞ্চ বলিতে Bengal Theatreই প্রথম। Bengal Theatre প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিষ্ঠান হইলেও রঙ্গপটু নাট্যকার বিহারীলালের প্রতি গিরিশচন্দ্রের অপরিসীম শ্রদ্ধা ছিল।

১৮৭৩ খৃষ্টাব্দেই Bengal Theatre প্রতিষ্ঠিত হওয়ার দুই-তিন মাস পরে বাগবাজারের বিখ্যাত ভুবন নিয়োগী মহাশয়ের উদ্যোগে Beadon Street-এ (বর্ত্তমানে যে স্থানে Minerva Theatre স্থাপিত) National Theatre শোভাবাজার হইতে স্থানান্তরিত হইয়া Great National Theatre নামে সুপ্রতিষ্ঠিত হইল। এখানে কয়েকমাস পুরাতন নাটকাদির অভিনয় হইতে লাগিল। ১৮৭৪ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারী গিরিশচন্দ্র-কর্ত্তৃক বঙ্কিমচন্দ্রের 'মৃণালিনী' উপন্যাসখানি নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত হইয়া অভিনীত হয়। ইহাই নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত দ্বিতীয় উপন্যাস। রমেশচন্দ্র দত্তের 'মাধবীকঙ্কণ' নামক উপন্যাসখানিও এই সময় গিরিশচন্দ্র-কর্ত্তৃক নাটকাকারে রূপান্তরিত হইয়া অভিনীত হইয়াছিল।

এই National Theatre-এ ঋষিকবি সুরেন্দ্রনাথের 'হামির' নামক নাটকখানি অভিনীত হয়।

১৮৭৪ হইতে ১৮৭৮ সাল—এই পাঁচ বছরের মধ্যে গিরিশচন্দ্র নিম্ন-লিখিত আটখানি Pantomime বা 'পঞ্চরং' রচনা করেন—(১) মাউসি, (২) Charitable dispensary, (৩) ধীবর ও দৈত্য, (৪) আলিবাবা, (৫) দুর্গাপূজার রং, (৬) Ciran Pantomime, (৭) সহিস হইল আজি কবি চূড়ামণি, (৮) A kiss in the dark; কেবলমাত্র ৮ম সংখ্যক পুস্তকখানি প্রকাশিত হয়। এগুলির প্রকাশক ছিলেন প্রথমযুগের অভিনেতা কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১২৮৫ সাল)।

১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে গিরিশচন্দ্র-কর্ত্তৃক মাইকেল মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ' কাব্যখানি নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত হইয়া জুলাই মাসে অভিনীত হয় এবং ইহার পর নবীনচন্দ্র সেনের 'পলাশীর যুদ্ধ' নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত হয়। উক্ত ১৮৭৭।৭৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যেই গিরিশচন্দ্র 'আগমনী', 'অকালবোধন' ও 'দোললীলা' নামক ক্ষুদ্র নাটিকা ও গীতিনাট্য রচনা করেন। ১৮৭৮ সালের জানুয়ারী মাসে 'বিষবৃক্ষ' নাটকাকারে রূপান্তরিত হয় এবং ২২শে জুন 'দুর্গেশনন্দিনী'ও নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত হয় এবং এই সকল নাটকেরই অভিনয় চলিতে থাকে।

গিরিশযুগের অভ্যুদয়

গিরিশচন্দ্র এতদিন সওদাগরী অফিসে চাকুরী করিলেও amateur হিসাবেই তিনি নাট্যান্দোলনে যোগ দিয়াছিলেন। এই সময় তিনি Great National Theatre-এর তাৎকালীন মালিক প্রতাপচাঁদ জহুরীর আমন্ত্রণে Parker Co.-র অফিসে ১৫০৲ টাকা বেতনের চাকুরী ছাড়িয়া মাত্র ১০০৲ টাকা বেতনে উক্ত থিয়েটারে Manager-এর পদ গ্রহণ করেন এবং নিজেকে সম্পূর্ণরূপে নাট্যবাণীর সাধনায় নিয়োজিত করেন। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন নাট্য আরাধনাই তাঁহার জীবনের একমাত্র আদর্শ ও গন্তব্য পথ।

গিরিশচন্দ্রের নাট্যকার জীবনারম্ভ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নাট্যকার গিরিশচন্দ্র

তখন ১৮৮০ সালের শেষ ভাগ। বঙ্গের নাট্যপ্রতিভা যেন ঘুমাইয়া পড়িল। যাহা কিছু নাটক অভিনয় করিবার উপযোগী ছিল সবই ফুরাইয়া গেল। বন্ধু ও সহচর-শিষ্যগণের অনুরোধে গিরিশবাবু তখন পূর্ণাঙ্গ নাটক লিখিতে আরম্ভ করিলেন। কারণ, ইতঃপূর্ব্বে তিনি কয়েকখানি গীতিনাট্য ও ক্ষুদ্র নাটিকা লিখিয়া তাঁহার শক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন। বন্ধুগণ-কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইলেও গিরিশচন্দ্র অনেক ইতস্ততঃ করিয়া প্রথমে 'মায়াতরু', 'মোহিনী', 'প্রতিমা', 'আলাদিন', 'আনন্দ রহো' এই চারখানি গীতিনাট্য রচনা করিলেন। কিন্তু তাঁহার বন্ধুগণ ইহাতে সন্তুষ্ট হইতে না পারিয়া যেরূপ অমিত্রাক্ষর ছন্দে তিনি বহুদিন পূর্ব্বে নাটক রচনার সঙ্কল্প প্রকাশ করিয়াছিলেন, সেইরূপ অমিত্রাক্ষর ছন্দে নাটক রচনার জন্য ধরিয়া বসিলেন। স্থির হইল 'রাবণ বধ' লেখা হইবে। নাটক লেখাপ্রসঙ্গে এখানে একটা কথা বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, গিরিশচন্দ্র নিজ হাতে একখানি নাটকও লিখেন নাই। তিনি মুখে বলিয়া যাইতেন এবং অপর এক ব্যক্তি তাহা লিপিবদ্ধ করিতেন। গিরিশবাবুর অন্যতম প্রিয় শিষ্য নাট্যাচার্য্য অমৃতলাল বসু মহাশয় বলিয়াছেন—"বিদ্যা-রূপিণী জননী স্বয়ং যেন তাঁহার কণ্ঠে অধিষ্ঠিতা হইয়া তিন সপ্তাহের কম সময়ের মধ্যে 'রাবণ বধ' নাটকখানি লিখিয়াছিলেন।"

ইহাই গিরিশচন্দ্রের সর্ব্বপ্রথম পূর্ণাঙ্গ নাটক। ১৮৮১ সালের ১৬ই শ্রাবণ এই নাটকখানির অভিনয়ের পর চারিদিকে জয় জয়কার পড়িয়া গেল। Byron-এর ন্যায় এক প্রভাতে ঘুম ভাঙ্গিয়া গিরিশবাবু হঠাৎ দেখিলেন তিনি বঙ্গবিখ্যাত নাট্যকার। তারপর গিরিশবাবু কত নাটক লিখিয়াছেন, কত প্রশংসা পাইয়াছেন।

নাটিকা, গীতিনাট্য, প্রহসন, পঞ্চরং প্রভৃতি লইয়া সর্ব্বসাকুল্যে গিরিশচন্দ্র ৯০ খানি নাট্যগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইহার মধ্যে 'নিত্যানন্দ বিলাস', 'চাবুক' ও 'বিধবার বিবাহ' এই তিনখানি নাটক কোথাও অভিনীত হয় নাই। ইহা ব্যতীত ৩ খানি উপন্যাস, ১৫টি ছোট গল্প, ১ খানি কবিতাগ্রন্থ, ১ খানি

ক্ষুদ্র জীবনী, ১৮টি ধর্ম্ম ও অধ্যাত্মবিষয়ক প্রবন্ধ এবং ১৪টি নাট্যপ্রবন্ধ, ২টি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ এবং ১২টি বিবিধ প্রবন্ধ রচনা করেন। গিরিশচন্দ্রের রচনাবলীর একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা স্থানান্তরে সংযোজিত হইবে।

গিরিশচন্দ্রের নাট্যসাহিত্য সম্বন্ধে সাধারণ আলোচনা

গিরিশচন্দ্র সাহিত্যসেবা হিসাবে নাটকাদি রচনায় প্রবৃত্ত হন নাই। বঙ্গীয় নাট্যশালায় অভিনয়োপযোগী নাটকাভাব ঘটাতেই, তিনি নাটক রচনায় প্রবৃত্ত হন এবং সেই সময় হইতে জীবনের পরিসমাপ্তি পর্য্যন্ত নাট্যসাহিত্যের সেবা করিয়া আসিয়াছেন। সেইজন্যই বোধ হয়, কেহ কেহ তাঁহাকে Bengal's greatest playwright বলিয়া থাকেন (Bengalee পত্রে 'মীরকাশিম' সমালোচনাকালে পাঁচকড়িবাবু বলেন)। কথাটা কবিপ্রতিভার ঔদাসীন্যের পরিচায়ক; কিন্তু আমাদের বোধ হয়, গিরিশচন্দ্রের নিরভিমানতাই এই উক্তির ভিত্তি। হইতে পারে, সংস্কৃত পদ্ধতি অনুসারে বর্ত্তমান কালের বাঙ্গালা নাটকগুলি ঠিক ঠিক নাটক নহে। কিন্তু বাঙ্গালা নাটকাবলীর আদর্শ যে কেবল সংস্কৃতের অনুবর্ত্তী হইবে তাহারও কোন সম্ভাবনা দেখা যায় না। বরং বাঙ্গালার সেই অমর কবি ও নাট্যকার মধুসূদন নাটকালোচনায় প্রথম প্রবৃত্ত হইয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, বঙ্গের ভবিষ্যৎ নাট্যকারগণ কেবলমাত্র সংস্কৃতের ক্ষীণ অনুকরণ করিয়াই নিশ্চিন্ত থাকিবেন এমন নহে; বরং আশা হয়, অদূরে এমন সকল নাট্যকার আবির্ভূত হইবেন, যাঁহারা সংস্কৃত আদর্শ পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র হইতে উচ্চতর আদর্শ গ্রহণ করতঃ নাটক রচনায় প্রবৃত্ত হইবেন।

কিন্তু আমাদের আলোচ্য গিরিশচন্দ্রের নাট্যগ্রন্থাবলীতে দেশীয় ও ইউরোপীয় উভয় প্রভাবই অপূর্ব্ব সামঞ্জস্যে মিলিত। উভয় পদ্ধতিরই আদর্শ গ্রহণ করিয়া তিনি এক অভিনব প্রণালী প্রবর্ত্তন করেন, যাহা তাঁহার নিজস্ব—বিজাতীয় হাবভাব ও অবয়বের কোন আভাস তাহাতে নাই। হয়তো গিরিশ-চন্দ্রের নানা চরিত্র-সৃষ্টিমধ্যে কোন কোন স্থানে একটু-আধটু বিজাতীয় আদর্শ বা ভাবাবেশ দেখিতে পাওয়া যাইবে; কিন্তু গিরিশচন্দ্র সেই সেই চরিত্রের পূর্ণাবস্থায় সেগুলিকে এমন আদর্শে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন যে, স্থানবিশেষের সামান্য দোষ আর নয়নগোচর বা বোধগম্য হইবে না। তিনি রামনারায়ণ, মধুসূদন বা দীনবন্ধু-প্রবর্ত্তিত প্রথা গ্রহণ না করিয়া নূতন আদর্শে, নূতন

প্রথায়, নূতন ভাষায় নাট্যসাহিত্য সেবায় ব্রতী হইয়াছিলেন। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন—"গিরিশচন্দ্রের নাটকরাশি গিরিশচন্দ্রের নিজের সামগ্রী, বাঙ্গালা ভাষায় অপূর্ব্ব, বাঙ্গালা সাহিত্যে নূতন।"

গিরিশচন্দ্রের নাটকের ভাষা সম্বন্ধে কেহ কেহ আপত্তি করেন; কিন্তু আমরা উহাপেক্ষা উপযোগী ভাষা বঙ্গীয় নাট্যে আর কি হইতে পারে তাহা এখনও দেখি নাই। কোন তথাকথিত খ্যাতনামা সাহিত্যিক গিরিশচন্দ্রের নাটকীয় ভাষা সম্বন্ধে বলেন —"গিরিশচন্দ্রের ভাষা অভিনয়োপযোগী বটে, কিন্তু পড়িতে ভাল লাগে না।" যে ভাষা অভিনয়োপযোগী অর্থাৎ উচ্চাঙ্গের আবৃত্তির উপযোগী, তাহা পড়িতে ভাল লাগে না! এমন অদ্ভুত সমালোচনা কখনও পাঠ করি নাই। শোনা যায়, Captain D. L. Richardson প্রভৃতি সুবিখ্যাত ইংরাজ অধ্যাপকগণ Shakespeare-এর নাটকাদি অধ্যাপনাকালে অভিনয়ের ন্যায় আবৃত্তি করিয়া ছাত্রগণকে শিক্ষা দিতেন। Shakespeare-এর রচনা যাহাতে ছাত্রগণের বিশেষভাবে হৃদয়ঙ্গম হইয়া তাহাদের আয়ত্ত হয়, তাহারই জন্য ঐভাবে আবৃত্তি করিতেন। অমিত্রাক্ষরের ক্ষীণ অনুকরণ দুই-একজন কবি বাঙ্গালা নাটকে প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহা অনেক স্থলে উপহাস্যাস্পদ ব্যতীত অন্য কিছুই হয় নাই।

গিরিশচন্দ্রের ভাষা ও ছন্দ

সংস্কৃত ভাষার আদর্শে বিচার করিলে গিরিশচন্দ্রের ভাষায় কিছু কিছু দোষ পাওয়া যায় বটে, কিন্তু গিরিশচন্দ্র রচনাকালে সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখেন নাই বলিয়াই আমাদের ধারণা। তাহার প্রধান কারণ তাঁহার ভাবপ্রবণতা। নাটকীয় চরিত্রমুখে কেবল প্রাণের কথা, কেবল ভাবের কথা কি করিয়া অতি সাদা-সোজা কথায় ফুটান যায় সেই দিকে ছিল গিরিশচন্দ্রের লক্ষ্য। ভাষার খুঁটিনাটির দিকে তাঁহার আদৌ দৃষ্টি থাকিত না। এমন কি, আমরা জানি যে, এই প্রবীণ-বহুবিজ্ঞ নাট্যকার বালক-সাহিত্যিকের কথায়ও লিখিত ভাষা পরিবর্ত্তন করিয়া দিতেন, কিন্তু ভাবে তিনি সর্ব্বদা সচল গিরীশবৎ। তিনি বলিতেন,—"বাঙ্গালা ভাষার প্রকৃত গঠন সম্বন্ধে এখনও মতদ্বৈধ আছে—পূর্ণতার সময় এখনও আসে নাই। আমরা ভাবকেই প্রধান মনে করি। ভাব-সম্পদে ভাষা গরীয়সী হইলেই বর্ত্তমানে যথেষ্ট হইবে। অন্যান্য অভাব একে একে পূর্ণ হইবে।" বস্তুতঃ, গিরিশচন্দ্র শব্দাড়ম্বরপূর্ণ ভাষার সৃষ্টি করেন নাই। তাঁহার রচনাবলীর যে স্থলেই আমরা দৃষ্টিপাত করি, সেইখানেই তাঁহার ভাষা প্রাণের ও মনোরাজ্যের ভাব-সম্পদের অপূর্ব্ব সরল কথারাশিতে পূর্ণ হইয়া

শতধারে প্রবাহিতা সুরতরঙ্গিণীর ন্যায় বিরাজমানা। তাঁহার অত্যুন্নত ভাবরাশি ভাষার দাসত্ব কদাচ করে নাই, বরং ভাষাই তাঁহার ভাবসমূহের চিরানুগামিনী।

মধুসূদনের পর দু'চার জন কবি বাঙ্গালা নাটকে অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্ত্তনে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। কিন্তু সম্পূর্ণ সফলকাম হইতে পারেন নাই। গিরিশচন্দ্রও অমিত্রাক্ষর ছন্দে নাটক রচনায় প্রবৃত্ত হন। কিন্তু তাঁহার প্রবর্ত্তিত অমিত্রাক্ষর ছন্দ মাইকেলের ব্যর্থ অনুকরণ নহে, উহা সংস্কৃত শব্দের বাহুল্য-বর্জিত এক স্বতন্ত্র ধরণের অমিত্রাক্ষর ছন্দ, উহার গতি সহজ, সরল ও স্বচ্ছন্দ, —যতি বজায় রাখিয়া পাঠ করিলে তাহা একেবারে খাঁটি 'গৈরিশী ছন্দ'। 'চণ্ড', 'কালাপাহাড়' ও 'মুকুল মঞ্জুরা' নামক নাটক তিনখানি তাহার দৃষ্টান্ত স্থল। সমসাময়িক মাসিক পত্রিকা 'ভারতী'তে স্বর্গীয় মনীষী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিয়াছিলেন—"আমরা শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্রের নূতন ধরণের অমিত্রাক্ষর ছন্দের বিশেষ পক্ষপাতী। ইহাই যথার্থ অমিত্রাক্ষর ছন্দ। ইহাতে ছন্দের পূর্ণ স্বাধীনতা ও ছন্দের মিষ্টতা উভয়ই রক্ষিত হইয়াছে। কি মিত্রাক্ষরে, কি অমিত্রাক্ষরে শাস্ত্রোক্ত ছন্দ না থাকিয়া হৃদয়ের ছন্দ প্রচলিত হয়—ইহাই আমাদের একান্ত বাসনা ও ইহাই আমরা করিতে চেষ্টা করিয়া আসিতেছি। গিরিশবাবু এ বিষয়ে আমাদের সাহায্য করাতে আমরা অতিশয় সুখী হইলাম।"

অমিত্রাক্ষর ছন্দের উপর নূতনত্ব সম্পাদনের কৈফিয়ৎ হিসাবে অর্থাৎ গৈরিশী ছন্দের কৈফিয়ৎ হিসাবে গিরিশচন্দ্র কবিবর নবীনচন্দ্র সেনের নিকট যে পত্র দিয়াছিলেন, আমরা এস্থলে আবশ্যকমত তাহা হইতে অংশবিশেষ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—"আমি বিস্তর চেষ্টা ক'রে দেখেছি, গদ্য লিখি সে এক স্বতন্ত্র, কিন্তু ছন্দোবদ্ধ ব্যতীত আমরা ভাষা-কথা কইতে পারি না। চেষ্টা করলেও ভাষা-কথা কইতে গেলেই ছন্দ হবে। সেইজন্য ছন্দে কথা—নাটকের উপযোগী।

* * * *

অমিত্রাক্ষর ছন্দ পড়বার সময় আমার যেমন ভাঙ্গা লেখা তেমনি ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়তে হয়। যেখানে বর্ণনা, সেখানে স্বতন্ত্র, কিন্তু যেখানে কথাবার্ত্তা —সেইখানেই ছন্দ ভাঙ্গা।

* * * *

আমার কথা এই যে, এস্থলে নাটকে চৌদ্দ অক্ষরে বাঁধা পড়া কেন? চৌদ্দ অক্ষরে বাঁধা পড়লে দেখা যায়, সময়ে সময়ে সরল যতি থাকে না।—

'বীরবাহু, চলি যবে গেলা যমপুরে অকালে'

এইরূপ হামেসাই হবে। বাঙ্গালা ভাষায় ক্রিয়া 'হইয়াছিল' অনেক সময়েই যতি জড়িত করবে। কিন্তু গৈরিশী ছন্দে সে আশঙ্কা নাই। যতি সম্পূর্ণ করিয়া সহজেই লেখা যাইবে। আর এক লাভ, ভাষা নীচ হ'তে বিনা চেষ্টায় উচ্চ স্তরে সহজেই উঠিবে। সে সুবিধা চৌদ্দ-র কিছু কম। কাব্যে তার বিশেষ প্রয়োজন নাই; কিন্তু নাটকে অধিকাংশ সময় তার প্রয়োজন।

স্বর্গীয় অক্ষয়চন্দ্র সরকারও গিরিশচন্দ্রের নূতন ছন্দের উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন। তিনি এ সম্বন্ধে 'সাধারণী'তে লিখিয়াছিলেন—"এতদিনে নাটকের ভাষা সৃজিত হইয়াছে।"

নাটকের সংলাপ রচনায় গিরিশচন্দ্র যে ছন্দের প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে মন্তব্যপ্রসঙ্গে অধ্যাপক ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছিলেন—"গিরিশচন্দ্র নাটকের কথোপকথনে যে একটি নূতন ছন্দের প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহা শুনিলে 'Many a winding bout of linked sweetness long drawn out' এই ইংরাজী কবি-রচনাটি সার্থক মনে হয়। নমুনাস্বরূপ—

'স্বয়ম্বরে যা'ব, লজ্জা পাই পা'ব,
নয়নে শ্রবণে বিবাদ মিটা'ব,
এ জীবনে পা'ব কি না পা'ব,
হেরিব সে কল্পনা প্রতিমা।।' " (নলের উক্তি)

(উক্ত পংক্তি কয়টি ললিতবাবুর পূর্ব্বস্মৃতি হইতে উদ্ধৃত। মূলের সহিত ইহার কিছু পার্থক্য আছে। আমরা মূলটি উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।—)

"স্বয়ম্বরে যাব, লজ্জা পাই পাব,
বারেক দেখিব,
নয়নে শ্রবণে বিবাদ ঘুচাব,
এ জীবনে কি বা পাব?
দেখিব সে কল্পনা প্রতিমা।"

গিরিশচন্দ্রের প্রতি নাটকে স্থানে স্থানে এইরূপ Many a winding bout of linked sweetness আছে। তাঁহার 'বুদ্ধদেব চরিতে' রাজা শুদ্ধোদন মহিষী মহামায়ার মৃত্যুতে আক্ষেপ করিয়া বলিতেছেন—

"হায় ঋষি, শূন্য দশ দিশি
প্রেয়সী বিহনে হেরি ;
ফুল্ল কমলিনী, জীবন সঙ্গিনী
কোথা গেল অভাগিনী।" ইত্যাদি।

তাঁহার সিদ্ধার্থ বলিতেছেন—

"সর্ব্বশক্তিমান্ যদি ভগবান্
দয়াবান্ কভু সে ত নয়।"

অন্যত্র—

"কিন্তু যদি থাকে কোন পাপ,
পুত্র বিনা যার হেতু পেতেছ সন্তাপ,
ইচ্ছায় সে পাপ আমি করিব গ্রহণ,
বধ রাজা, আমার জীবন!" ইত্যাদি

চরিত্র-চিত্রাঙ্কনে গিরিশচন্দ্রের বৈশিষ্ট্য

গিরিশচন্দ্রের অনন্যসাধারণ ক্ষমতা তাঁহার চরিত্র-চিত্রাঙ্কন-পটুতা। কম-বেশী তাঁহার আশিখানি নাট্যগ্রন্থাবলীর মধ্যে প্রায় আটশত বিবিধ চরিত্র চিত্রিত হইয়াছে। তন্মধ্যে কতকগুলি পৌরাণিক, কতকগুলি ঐতিহাসিক, কতকগুলি সামাজিক ও কতকগুলি সম্ভব আদর্শ হইতে গৃহীত। কিন্তু একথা বেশ বলা যায় যে, প্রায় সকল ক্ষেত্রেই তিনি একটু অসাধারণ নিজস্ব ঢালিয়া দিয়া সেই সকল দেব ও মানবচরিত্র বিভিন্ন ভাবে, বিভিন্ন বর্ণে চিত্রিত করিয়াছেন। পুরাণ হইতে, ইতিহাস হইতে, উপাখ্যান হইতে এবং সমাজ হইতে গিরিশচন্দ্র বহুতর চিত্র গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু সর্ব্বত্রই তাঁহার সেই নিজস্ব ভাবের ছাপ আঁটিয়া সেগুলিকে এমন একটা নূতন অবয়বে, নূতন হাবভাববিশিষ্ট করিয়া উপস্থিত করিয়াছেন যে, তাঁহার সূক্ষ্ম-দৃষ্টি ও দিব্যদৃষ্টির প্রভাব, তাঁহার মৌলিকতা ও মহাপ্রাণতার উজ্জ্বল আভাস সেগুলিতে স্পষ্ট পরিস্ফুট। তাঁহার চিত্রিত রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, চৈতন্য, শঙ্করাচার্য্য, অশোক ও বিশ্বামিত্রে যেমন পুরাণেতিহাসাতিরিক্ত কিছু কিছু ভাব-সম্পদ অপূর্ব্ব

সামঞ্জস্যের সহিত সম্মিলিত, তাঁহার যোগেশ, কালীকিঙ্কর, করুণাময় ও প্রসন্ন-কুমারেও তেমনি সামাজিক আদর্শাতিরিক্ত সামগ্রীর সমাবেশ। আবার তাঁহার সিরাজদ্দৌলা, মীরকাশিম, ছত্রপতি প্রভৃতি ঐতিহাসিক চরিত্রগুলিতে যেমন মানবমনের বিভিন্নাবস্থার বিচিত্র অত্যাবশ্যক ছবিগুলি মুকুর প্রতিবিম্ববৎ স্পষ্ট দেদীপ্যমান, তাঁহার পাগলিনী, গঙ্গাবাঈ, হরমণি, নশীরাম, চিন্তামণি, ও রঙ্গলাল প্রভৃতি আদর্শ চিত্রগুলিতেও তেমনই দেব-মানবত্বের অপূর্ব্ব সম্মিলন। আবার গিরিশচন্দ্র মানব সাধারণের মনের ভাব, মনের ভিন্ন ভিন্ন মানসিক অবস্থার ছবি বা মানুষের অনুভূতির প্রতিকৃতিসকল তাঁহার 'কালাপাহাড়ের—কালাপাহাড়ে', তাঁহার 'জনার—বিদূষকে', তাঁহার 'শঙ্করাচার্য্যের—জগন্নাথে', তাঁহার 'তপোবলের—সদানন্দে' কেমন সুস্পষ্ট প্রতিফলিত করিয়া পাঠক বা দর্শকগণের সমক্ষে উপস্থাপিত করিয়াছেন। আবার সেই সকল অনুভূতি-চিত্রের চরমোন্নতি ও পূর্ণ বিকাশের জন্য সেই সকল অবস্থার দোদুল্যমান সন্দেহ নিরসন-জন্য 'কালাপাহাড়ে চিন্তামণি', 'জনায় শ্রীভগবান্—মুরলীধারী স্বয়ং', 'শঙ্করাচার্য্যে মহামায়া' ও 'তপোবলে ব্রহ্মণ্যদেব' অভিনব সৃষ্টিতে, অভিনবভাবে আবির্ভূত হইয়া প্রতিনিয়ত পূর্ব্বোল্লিখিত চরিত্রগুলির আশে পাশে ছায়ার মত ঘুরিয়া কেমন মনোমতভাবে, কেমন অজ্ঞাতসারে ধীরে ধীরে তাহাদের পরিবর্ত্তনের, তাহাদের সমুন্নয়নের, তাহাদের পূর্ণ বিকাশের সুযোগ দিয়াছেন।

সনাতন আদর্শের প্রচারক গিরিশচন্দ্র

গিরিশচন্দ্র লৌকিক আচার অনুষ্ঠানের প্রত্যেক বিষয়ে নৈষ্ঠিক হইতে না পারিলেও, ভাবে তিনি প্রকৃত হিন্দু সন্তান ছিলেন। হিন্দুশাস্ত্রে তাঁহার বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা ছিল অসাধারণ। হিন্দুশাস্ত্রের মহিমায় চির-বিমুগ্ধ ছিলেন বলিয়াই গিরিশচন্দ্র সনাতন শাস্ত্রের সৌন্দর্য্য ও অসাধারণ জ্ঞানসম্পদ জড়বিজ্ঞান-প্রভাবিত বর্ত্তমান সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার নিমিত্ত তাঁহার নানা নাট্যগ্রন্থের অঙ্কে অঙ্কে সমাবেশ করিয়াছেন। গিরিশবাবুর ন্যায় কয়জন ক্ষমতাশালী কবি আজকাল হিন্দুর চক্ষে, বিজাতীয় শিক্ষা-দীক্ষা-বিপর্য্যস্ত বর্ত্তমান হিন্দুসমাজের চক্ষে সনাতন ধর্ম্মের আদর্শসকল এমন সুন্দর ভাবে তুলিয়া ধরিয়াছেন? গিরিশচন্দ্র ছিলেন সনাতন শাস্ত্রের মহিমা কীর্ত্তন-কারী অসাধারণ প্রতিভাশালী কবি দার্শনিক। গিরিশচন্দ্রের নাটকাবলীতে ভক্তি আছে—কর্ম্ম আছে—জ্ঞান আছে—প্রেম আছে এবং মুক্তির কথাও আছে। গিরিশচন্দ্র প্রথম স্তরের নাট্যগ্রন্থে 'ভক্তিরস' ফুটাইয়াছেন, মধ্যস্তরের রচনায় 'ধর্ম্মতত্ত্ব' প্রকটিত করিয়াছেন এবং শেষ স্তরের নাটকগুলিতে 'জ্ঞানমহিমা' প্রচার

করিয়াছেন। হিন্দুধর্ম্ম সাধনোপায়ের এই তিনটি মহাপন্থা অপক্ষপাতে উজ্জ্বলভাবে নয়ন-মনোমুগ্ধকর চিত্রাবলীতে অঙ্কিত করার মত শক্তিশালী কবি বা নাট্যকার সত্যই বিরল।

গীতরচয়িতা গিরিশচন্দ্র

গিরিশচন্দ্রের আর একটি সর্ব্ববাদিসম্মত বিশেষত্ব—তাঁহার গানরচনা। গীতরচনায় তিনি বাঙ্গালায় সে যুগে অদ্বিতীয় ছিলেন। এমন দিন গিয়াছে, যখন তাঁহার গান বাঙ্গালার মজলিসে, মাইফেলে, জলসায়, পথে-ঘাটে, মন্দিরে-শ্মশানে, যেখানে সেখানে শোনা যাইত। শুধু তাহাই নহে, ভারতের সর্ব্বত্র এমন কি, ভারতেতর দেশেও যেখানে দুই-দশ জন বাঙ্গালী সমবেত হইত, সেখানেই গিরিশচন্দ্রের গান শোনা যাইত। শ্রদ্ধাস্পদ সমাজপতি মহাশয় লিখিয়াছেন—"গিরিশচন্দ্র গীতি-কবিতায় সিদ্ধ ছিলেন। গিরিশের গান াঙ্গালায় অমর হইয়া থাকিবে। তাহা খাঁটি বাঙ্গালীর গান। সে গানে বাঙ্গালা দেশের কবির, প্রেমিকের, নিরাশের, সুখীর, দুঃখীর, ব্যথিতের, বিপন্নের, সাধকের, ভক্তের, ধর্ম্মোন্মাদের হৃদয়ের উচ্ছ্বাস—হৃদয়স্পন্দন অনুভব করা যায়।"

অধ্যাপক ললিতকুমার বলেন—"গিরিশচন্দ্রের রচিত গানে একটি স্বচ্ছ সরলতা ও অনুপম মাধুর্য্য অনুভব করিতাম।" পূজনীয় পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন—"ললিত পদছন্দে সুরানুসারী ভাব-বিকাশে তাঁহার (গিরিশচন্দ্রের) অনেক গান বাঙ্গালা ভাষায় অতুল্য সম্পত্তি হইয়া রহিয়াছে। সহজ ভাষায়, সোজা কথায় গভীর তত্ত্বপূর্ণ গান তিনি যেমন রচনা করিয়াছেন, ইংরেজীনবীশ কোন কবিই তেমন পারেন নাই। তাঁহার গান চাষাভুষায়ও সানন্দে গীত করে। যতদিন বাঙ্গালা ভাষা থাকিবে, বাঙ্গালীর হৃদয়ে হিন্দুভাব সজীব থাকিবে, ততদিন গিরিশচন্দ্রের গান বাঙ্গালা সাহিত্য-ক্ষেত্রে অক্ষয়বটরূপে বিরাজ করিবে।" গিরিশচন্দ্রের গানের কথা আর বেশী করিয়া বলার আবশ্যক করে না। স্বরচিত নাটক-প্রহসনে, অন্যান্য লোকের রচিত নাটকাদিতে এবং যে সমস্ত উপন্যাস ও কাব্য নাটকে রূপান্তরিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে এবং বিবিধ ঘটনা ও অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে গিরিশচন্দ্র যে সকল গীত রচনা করিয়াছিলেন, তাহা সংখ্যায় প্রায় সহস্রাধিক। তাঁহার ভক্তিমূলক গীতগুলি অধিকতর জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল। আমরা প্রথম জীবনে বৈরাগীর কণ্ঠে "কেশব কুরু করুণা দীনে কুঞ্জকাননচারী" প্রভৃতি গীত শুনিয়া ভোরে শয্যা ত্যাগ করিতাম। উচ্চশিক্ষিত আধুনিক সমাজেও গিরিশচন্দ্রের ভক্তিমলক গানের স্বীকৃতি আছে। বিশিষ্ট আসরে প্রথিতযশা সঙ্গীতকলাবিদ্

ও সুপণ্ডিত শ্রীদিলীপকুমার রায়ের কণ্ঠে "রাঙা জবা কে দিলে তোর পায়ে মুঠো মুঠো" গানখানি শুনিয়া মুগ্ধ হন নাই, এমন শ্রোতা বোধ হয় নাই।

"আমায় নিয়ে বেড়ায় হাত ধ'রে
যেখানে যাই সে যায় সাথে,
আমায় বল্‌তে হয় না জোর ক'রে।"

ইত্যাদি গীত যেন অন্তরের বিশ্বাস ও ভক্তি ছানিয়া রচিত হইয়াছে।

গিরিশচন্দ্রের কাছে শাক্ত ও বৈষ্ণবের পার্থক্য ছিল না। হরি ও হরকে তিনি 'কায় কায়' মিশাইয়া দিয়াছেন। যেমন শাক্তসঙ্গীত, তেমন বৈষ্ণবসঙ্গীত; উভয়বিধ সঙ্গীতই তাঁহার লেখনীতে প্রাণময় হইয়া উঠিয়াছে। 'রাই কালো ভালবাসে না', 'ধরম করম সকল গেল গো, শ্যামা পূজা মম হোলো না', 'কেশব কুরু করুণা দীনে', 'যাই গো ঐ বাজায় বাঁশী প্রাণ কেমন করে' প্রভৃতি গানগুলি মর্ম্মে প্রবেশ করিয়া প্রাণকে বাস্তবিকই একেবারে আকুল করিয়া তোলে। অনুভূতির তীব্রতা এবং অন্তরের স্বাভাবিক প্রেরণা না থাকিলে সহজ সরল ভাষায় এমন ভাবসমৃদ্ধ গান রচনা কি কখনও সম্ভবপর?

এমন এক সময় ছিল যখন 'বিল্বমঙ্গল' ও 'চৈতন্যলীলা'র গানে সারা কলিকাতা মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল এবং তাহার ঢেউ সুদূর তীর্থস্থানগুলিতেও পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল।

বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজাধিরাজ বিজয়চাঁদ মহাতাব বাহাদুর টাউন হলের স্মৃতিসভায় গিরিশচন্দ্রকে 'ক্ষেপা মায়ের ক্ষেপা ছেলে' বলিয়া বিশেষিত করিয়াছিলেন। মনে হয়, 'বিল্বমঙ্গল' নাটকের—

"আমার পাগল বাবা, পাগলী আমার মা,
আমি তাদের পাগলী মেয়ে,
আমার মায়ের নাম শ্যামা।"

ইত্যাদি গানখানি তখন তাঁহার স্মৃতিপটে উদিত হইয়াছিল।

বস্তুতঃ, বৈষ্ণব পদাবলী এবং রামপ্রসাদ ও কমলাকান্তের শাক্ত-সঙ্গীতগুলির মত গিরিশচন্দ্রেরও বহু সঙ্গীত বাংলা গীতাবলীর মধ্যে যে একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া থাকিবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

গিরিশচন্দ্রের গীতাবলীর মধ্যে দ্বৈত-সঙ্গীতগুলির কথাও উল্লেখযোগ্য। বিভিন্ন নাটকে তিনি বহু দ্বৈত-সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন। তখনকার দিনে কবি অনেক ছিলেন কিন্তু গিরিশচন্দ্র ছাড়া দ্বৈত-সঙ্গীত রচনায় তেমন পটুত্ব

কেহ দেখাইতে পারেন নাই। নমুনাস্বরূপ 'জনা' নাটকের একটি সঙ্গীত উদ্ধৃত করা যাইতে পারে—

দেশ—মিশ্র ঠুংরী

"যোগিনীগণ—বনফুল ভূষণ শ্যাম মুরলীধর
গোপিনীরঞ্জন বিপিনবিহারী।
প্রমথগণ—বিভূতিছাদন, বিষাণবাদন
ঈশান ভীষণ শ্মশানচারী॥
যোগি—দুকূল চোরা রাসরসিকবর,
প্রমথ—উলঙ্গ ভৈরব ধূর্জটী স্মরহর
যোগি—রুণু রুণু ঝুণু ঝুণু মঞ্জির গুঞ্জন,
প্রমথ—ডমরু ডিমি ডিমি তাণ্ডব নর্ত্তন;
যোগি—মনোন্মাদিনী, রঙ্গিণী
গোপিনীমোহন মান-ভিখারী।
প্রমথ—মূঢ় চন্দ্রচূড় হাড়মালগল
জটা-তরঙ্গিত জাহ্নবী বারি॥"

আলোচ্য সঙ্গীতটির পদবিন্যাস বিশেষ লক্ষ্যণীয়। বর্ণনীয় বিষয়ের সহিত ভাষার কি অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য।

গিরিশচন্দ্রের বহু সঙ্গীত ছন্দ ও সুরের মাধুর্য্যের জন্য সে যুগের কন্‌সার্টের গৎ-এ পরিণত হইয়াছিল। 'সীতার বনবাসের'—"চমকে চপলা চমকে প্রাণ, চাহ মা চপলাহাসিনী" গীতটি 'কন্‌সার্ট পার্টি ও ব্যাণ্ডপার্টি'র বাজনায় প্রায়ই শুনা যাইত। শান্তিপুরের তন্তুবায়দের বোনা রুমালে গিরিশচন্দ্রের গানের পংক্তি দিয়া পাড় লাগান হইত—ইহাও আমরা দেখিয়াছি।

'প্রফুল্ল' নাটকের বৈরাগ্যোদ্দীপক নিম্নলিখিত গানখানি শেষরাত্রে শ্মশান-চারিণী ভৈরবীদের মুখে অনেকেই শুনিয়াছেন—

ভৈরবী—পোস্তা

"মন আমার দিন কাটালি, মূল খোয়ালি,
ভাল ব্যাসাত কর্‌লি ভবে।
একলা এলে, একলা যাবে, মুখচেয়ে কার ঘুর্‌ছ তবে।
কে তুমি বল্‌ছো 'আমি',
দেখ ভেবে আর ভাব্‌বি কবে,—
ভাঙ্‌বে মেলা, ঘুচ্‌বে খেলা,
চিতার ছাই নিশানা রবে॥"

গিরিশচন্দ্রের সৃজনী-প্রতিভা যে কেবল মাতৃভাষার মধ্যেই স্ফূর্ত্তিলাভ করিয়াছিল তাহা নহে। ইংরাজীতে সঙ্গীত রচনায়ও তিনি শক্তির পরিচয় দিয়াছেন; এমন কি জাপানী ভাষাতে গীত রচনা করিতেও তিনি ছাড়েন নাই।* যদিও জাপানী ভাষা না জানার জন্য তাঁহাকে এ বিষয়ে বিশেষ আয়াস স্বীকার করিতে হইয়াছিল।

সমুদ্রের মধ্য হইতে রত্ন আহরণ করিতে গিয়া কোন্‌টি ভাল কোন্‌টি মন্দ, কোন্‌টি গ্রহণ করিব আর কোন্‌টি বর্জন করিব তাহা বিচার করা যেরূপ অসম্ভব, গিরিশচন্দ্রের সঙ্গীত-রত্নাকর হইতে কোন্ গানটি উদ্ধার করিব আর কোন্‌টি উদ্ধার করিব না, তাহা নির্ণয় করাও সেইরূপ দুরূহ। আমরা উপস্থিতমত যাহা পাইয়াছি তাহারই কয়েকটি কুড়াইয়া লইয়া সুধিগণের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছি।

বুদ্ধদেব-চরিত—

"জুড়াইতে চাই, কোথায় জুড়াই
কোথা হ'তে আসি, কোথা ভেসে যাই।
ফিরে ফিরে আসি কত কাঁদি হাসি,
কোথা যাই সদা ভাবি গো তাই।
কে খেলায়, আমি খেলিবা কেন,
জাগিয়া ঘুমাই, কুহকে যেন;
এ কেমন ঘোর, হবে না কি ভোর,
অধীর অধীর যেমতি সমীর,
অবিরাম গতি নিয়ত ধাই।
কী কাজে এসেছি, কী কাজে গেল;
কে জানে কেমন, কি খেলা হোল।
প্রবাহের বারি, রুধিতে কি পারি,
যাই যাই কোথা, কূল কিনারা নাই।"

এই গানটি শ্রীশ্রীপরমহংসদেব শুনিতে ভালবাসিতেন এবং স্বামীজী প্রায়ই এই গানটি গাহিতেন।

আবুহোসেন, বৈতালিকগণ—

"রুচির জ্যোতি কনক কিরণ গগনে নব রবি সচেতন।"

* গিরিশ গ্রন্থাবলী, ৩য় ভাগ, ২৮৮-২৮৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

শ্রীমন্তের মশান—

"চরম সময় হও মা উদয়, দেখে মরি তারা শ্রীপদনলিনী
ডাকি দুর্গা ব'লে কেন আছ ভুলে দুর্গমে দে দেখা দানবদলনী।"

সীতারাম ; জয়ন্তীর গান—

"উদার অম্বর শূন্য সাগর শূন্যে মিলাও প্রাণ।"

কপালকুণ্ডলা ; কাপালিকের গান—

"নররুধির তৃষাতুর নেহার ভূমি দূরে।"

ভাব ও সুরের অপূর্ব্ব মিশ্রণে এই সকল গান সত্যই চিত্তাকর্ষক। গিরিশচন্দ্রের মত এমন বিভিন্ন রসাশ্রিত সঙ্গীতরচনায় খুব কম কবিই দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন।

গিরিশ-প্রতিভার আর একদিক তাঁহার অনুবাদশক্তি। Shakespeare-এর 'ম্যাক্‌বেথে'র অনুবাদের কথা স্থানান্তরে বলা হইয়াছে। এই অনুবাদের পর হইতে গিরিশচন্দ্র পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট ইংরাজী সাহিত্যে সবিশেষ ব্যুৎপন্ন বলিয়া খ্যাতিলাভ করেন। স্যার গুরুদাস প্রমুখ অনেকেরই ধারণা ছিল witch-এর ভাষার অবিকল অনুবাদ কাহার দ্বারা সম্ভব নহে। কিন্তু একমাত্র গিরিশচন্দ্রই এই অসম্ভবকে সম্ভব করিয়াছিলেন। গিরিশচন্দ্রের সাফল্যের সামান্য পরিচয় হিসাবে আমরা নিম্নে 'ম্যাক্‌বেথ' হইতে কিছু কিছু অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—

গিরিশচন্দ্রের অনুবাদ শক্তি

" *1st Witch* :

When shall we three meet again,
In thunder, lightning, or in rain?

2nd Witch :

When the hurlyburly's done,
When the battle's lost and won."

অনুবাদ—

১ম—"দিদি লো বল্ না আবার মিল্‌ব কবে তিন বোনে,
যখন ঝ'রবে মেঘা ঝুপুর ঝুপুর
চক্ চকাচক্ হানবে চিকুর

কড় কড়াকড় কড়াৎ কড়াৎ
ডাক্‌বে যখন ঝন্‌ঝনে ?
২য়—যখন বাধ্‌বে মাতবে, হারবে জিন্‌বে—
থামবে লড়াই রণরণে ॥"

" *1st Witch* : Where to meet ?
2nd Witch : Upon the heath.
3rd Witch : There to meet Macbeth.'

"১ম—কোন্‌খানে বোন্ কোন্‌খানে—বোন্ কোন্‌খানে ?
ঠিক্‌ঠাক্ বলে দে লো যেতে হবে কোন্‌খানে ?
২য়—চুষণো ষাঁড়ীর মাঠে যাব,
৩য়—ম্যাক্‌বেথেরে দেখা দেবো—ঘাপটি মেরে এককোণে—"

আর একস্থানে—

" A sailor's wife had chestnuts in her lap
And she munched and munched and munched."

অনুবাদ—

"এলো চুলে মালার মেয়ে ব'সে উদোম গায়
ভোর কোঁচড়ে ছেঁচা বাদাম চাকুম্ চাকুম্ খায় ॥"

Lady Macbeth-এর অসুখের কথা শুনিয়া Macbeth ডাক্তারকে

" Canst thou not minister to a mind diseased ;
Pluck from the memory a rooted sorrow ;
Raze out the written troubles of the brain ;
And, with some sweet oblivious antidote,
Cleanse the stuffed bosom of that perilous stuff,
Which weighs upon the heart ?
Doctor—Therein the patient must minister to himself."

অনুবাদ—

"পার নাকি মনোব্যাধি করিতে মোচন
স্মৃতি হ'তে উখাড়িতে নার কি হে তুমি
দুরন্ত সন্তাপ বদ্ধমূল?
অগ্নিবর্ণে—থরে থরে মস্তিষ্ক মাঝারে
লেখা অনুতাপ লিপি—
আছে কি কৌশল তব মুছিবারে তায়?
অন্তর গরল যার প্রবল পীড়নে,
ব্যথিত হৃদয়াগার—
বিস্মৃতি অমৃতবারি করি দান
ধৌত কর পার যদি—
ডাক্তার—এ ভীষণ রোগে মাত্র রোগীই ভিষক্।"

ক্লাসিক থিয়েটারে 'ম্যাক্‌বেথে'র অভিনয় দেখিয়া হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতিদ্বয় চন্দ্রমাধব ঘোষ ও গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সুবিখ্যাত কে. জি. গুপ্ত এবং ব্যারিষ্টার পি. এল. রায় যুক্তভাবে নিম্নরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন—

" To translate the inimitable language of Shakespeare was a task of no ordinary difficulty ; but Babu Girishchandra Ghosh has performed that difficult task very creditably on the whole, and his translation is in many places quite worthy of the original."

গিরিশচন্দ্রের পূর্ব্বে মনীষিদ্বয় হরলাল রায় ও ননীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় যথাক্রমে 'রুদ্রপাল' ও 'রুদ্রসেন' নামে ম্যাক্‌বেথের দুইখানি অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু গিরিশচন্দ্রের অনদিত ম্যাক্‌বেথের সহিত উহাদের তুলনা করা যায় না।

আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত আছি যে, প্রেসিডেন্সী কলেজের তদানীন্তন প্রিন্সিপ্যাল টনি সাহেব (C. H. Tawney) একদিন অধ্যাপনার জন্য দুইখানি বই লইয়া ক্লাসে প্রবেশ করেন। প্রথম গ্রন্থখানি দেখাইয়া তিনি সংক্ষেপে 'ম্যাক্‌বেথ'-এর গল্পটি বলিলেন, পরে দ্বিতীয় বইখানি দেখাইয়া তিনি ছাত্রদের বলেন—"আশা করি, তোমরা অনেকেই এই বইখানি পড়িয়াছ। যদি কেহ না পড়িয়া থাক তবে অবশ্যই এককপি লইয়া পড়িয়া ফেলিবে।

এখানি তোমাদের দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকার গিরিশচন্দ্রের অনূদিত 'ম্যাক্‌বেথ'। মাতৃভাষায় এই বইখানি পড়িয়া তোমরা ম্যাক্‌বেথের যথাথ রসাস্বাদন করিতে পারিবে।"

Pope-এর 'Eloisa to Abelard' হইতে কয়েকটি পংক্তি—

" In these deep solitudes and awful cells,
Where heavenly-pensive contemplation dwells,
An ever-musing melancholy reigns ;
What means this tumult in a Vestal's veins ?"

মূলের সহিত অনুবাদের সাদৃশ্য রক্ষায় কবি কতখানি যত্নবান্ তাহা বিশেষ লক্ষ্যণীয়।

"গভীর নিভৃত হেন ভীষণ মন্দিরে,
চিন্তাসতী মূর্ত্তিমতী বিরাজিত ধীরে,
বিহরে বিষাদ যথা ভাবনা মগন ;
কেন হেন বিচঞ্চল তপস্বিনী মন ?"

গিরিশচন্দ্র সর্ব্বত্রই যে মূল অবিকৃত রাখিয়া অনুবাদ করিয়াছেন তাহা নহে। কখনও বা স্বাধীনভাবে, কখনও বা তাঁহার ভাষার মাধুর্য্যের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই অনুবাদ করিয়া গিয়াছেন, যেমন—

Parker-এর 'Indian Lover's Song'-এর কয়েকটি পংক্তি—

" Hasten, love, the sun hath set ?
And the moon, through twilight gleaming,
On the mosque's white minaret,
Now in silver light is streaming.
All is hush'd in deep repose ;
Silence rests on field and dwelling,
Save where the bulbul to the rose
Is a love-tale sweetly telling.
Save the ripple, faint and far,
Of the river softly gliding ;
Soft as thine own murmurs are,
When my kisses getnly chiding."

অনুবাদ—

"এস প্রিয়ে ত্বরা করি, ডুবিল তিমির অরি
চন্দ্রোদয়ে গোধলি ভেদিয়ে,
শুভ্র মস্‌জিদের শির, শোভিত রজত নীর,
ধায় শুভ্র কিরণ বহিয়ে।
নীরব সকল রব, নিদ্রিত মানব সব,
বুল্‌বুল পাখী শুধু জাগে,
প্রেমে পুলকিত হিয়া, গোলাপের কাছে গিয়া,
প্রেমকথা কয় অনুরাগে।
দূরস্থিত স্রোতস্বতী, মরি মরি করে গতি,
আসে ধ্বনি জিনিয়া সুতান;
সেইরূপ মৃদুরবে, চুম্বন করিছে যবে,
ছি ছি বলি ফিরাও বয়ান॥"

John Gay-এর 'A Ballad'-এর কিয়দংশ—

"'twas when the seas were roaring
With hollow blast of wind;
A damsel lay deploring,
All on a rock reclined.
Wide o'er the foaming billows
She cast a wistful look;
Her head was crowned with willows,
That trembled o'er the brook
Twelve months are gone and over,
And nine long tedious days.
Why didst thou, venturous lover,
Why didst thou trust the seas;"

অনুবাদ—

"দেখাইতে আশুগতি, বেগে চলে আশুগতি,
জলনিধি গরজে ভীষণ;
সন্তাপিতা একাকিনী, শিলাতলে বিরহিণী,
হেরিলাম শয়নে তখন।

নয়ন-কমলে বারি, ঝরিছে মুকুতা সারি,
বিস্তার জলধিপানে চায় ;
বিবশা বর্জ্জিতা বেশ, আকুল কুঞ্চিত কেশ,
মনোহর উড়িতেছে বায়।
বৎসর হয়েছে পাত, নয় দিন তার সাথ
প্রাণনাথ এলো না আমার ;
কেন হে হৃদয়ধন, করিয়ে দারুণ পণ,
জলনিধি হ'তে গেলে পার।"

বায়রণের 'Childe Harold'-এর পংক্তিদ্বয়—

"Nearer, clearer, deadlier than before
Arm, arm, it is—it is the cannon's opening roar!"

অনুসরণ করিয়া নবীনচন্দ্র 'পলাশীর যুদ্ধে' 'ক্রম ক'রে দূরে তোপ গর্জ্জিল অমনি' পংক্তিটি প্রয়োগ করেন। প্রথম আলাপের দিনেই গিরিশচন্দ্র নবীনবাবুকে বলিলেন যে, অনুবাদটি ভাল হয় নাই। "আপনি কিরূপ অনুবাদ করিতেন?" নবীনচন্দ্র এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে গিরিশচন্দ্র মুখে মুখে অনুবাদ করিয়া দেন—

"নিকট প্রকট ক্রমে বিকট গর্জ্জন,
অস্ত্র ধর অস্ত্র ধর—কামান ভীষণ।"

এই আলাপের সূত্র ধরিয়াই উভয়ের মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব হইয়াছিল।

নাটকরচনায় গিরিশচন্দ্রের বৈশিষ্ট্য

গিরিশচন্দ্র-রচিত নাট্যগ্রন্থসমূহের তালিকা হইতে দেখা যায়, তিনি পৌরাণিক নাটক দিয়া নাট্যকার জীবন শুরু করিয়া পৌরাণিক নাটকেই নাট্যকার জীবনের পরিসমাপ্তি করিয়াছেন। বস্তুতঃ গিরিশচন্দ্র নাটকের মধ্য দিয়া সমাজকে শিক্ষা দিবার কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন। আমাদের দেশের জনসাধারণকে মহৎ আদর্শের দিকে টানিয়া আনিতে হইলে, পৌরাণিক চরিত্রকে বাদ দিয়া আদর্শ হিসাবে তুলিয়া ধরিবার মত মহত্তর চরিত্রের সন্ধান আর কোথাও নাই। পুরাণাদির প্রতি এ দেশের লোকের একটা স্বাভাবিক শ্রদ্ধা আছে। সুতরাং পৌরাণিক চরিত্র তাহাদের অন্তরে যেরূপ আবেদন সৃষ্টি করিতে পারে, অন্য কোন চরিত্র তাহা পারে না। এই কারণেই গিরিশচন্দ্র লোকশিক্ষার

অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিষয় হিসাবে পুরাণকে আশ্রয় করিয়া নাটক লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এ-সম্বন্ধে গিরিশচন্দ্রের নিজের উক্তি হইতে কিঞ্চিৎ এখানে উদ্ধৃত হইল—"যিনি নাটক লিখিবেন তাঁহাকে দেশীয় ভাবে অনুপ্রাণিত হইতে হইবে। দেশীয় স্বভাব-শোভা, দেশীয় নায়ক-নায়িকা, দেশীয় অবস্থা, উপস্থিত ক্ষেত্রে দেশীয় মানব-হৃদয়স্রোত তাঁহাকে দৃঢ়রূপে মনোমধ্যে অঙ্কিত করিতে হইবে। বাল্যকাল হইতেই হিন্দু—শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ, ভীষ্ম, অর্জুন, ভীম প্রভৃতিকে চিনে, সেই উচ্চ আদর্শে গঠিত নায়কই হিন্দুর হৃদয়গ্রাহী হওয়া সম্ভব। যেরূপ বীরচিত্র যুদ্ধপ্রিয় বীরজাতির আদরের, সেইরূপ সহিষ্ণু, আত্মত্যাগী, লোকধর্ম্মের সম্মানকারী নায়ক হিন্দুহৃদয়ে স্থান পাইবে। হিন্দুস্থানের মর্ম্মে মর্ম্মে ধর্ম্ম, মর্ম্মাশ্রয় করিয়া নাটক লিখিতে হইলে ধর্ম্মাশ্রয় করিতে হইবে। এই মর্ম্মাশ্রিত ধর্ম্ম বিদেশীয় ভীষণ তরবারির ধারে উচ্ছেদ হয় নাই।"

"যত জাতির যত উচ্চ গ্রন্থ আছে, সকলই Mythological অর্থাৎ পৌরাণিক গ্রন্থ অবলম্বনে লিখিত। পৌরাণিক গ্রন্থ অবলম্বনে হোমার; পৌরাণিক গ্রন্থ অবলম্বনে ভার্জিল; খ্রীষ্টীয় পুরাণ অবলম্বনে মিল্‌টন; পৌরাণিক গ্রন্থ অবলম্বনে বাঙ্গালায় মাইকেল।"

"* * * মেরী কোরেলী আধুনিক, যাঁহার পুস্তক পাদরী-বিদ্বেষিত হইয়া এক সংস্করণে দেড় লাখ বিক্রয় হয়; খ্রীষ্টীয় পুরাণ, বাইবেল তাহার ভিত্তি।"

"* * * নাটক লিখিতে হইলে কতকগুলি চরিত্র লইয়া নাটক লিখিতে হয়। যদি চরিত্র পাওয়া যাইত, যাহা পুরাণে নাই, তাহা হইলেও কথা ছিল। * * * যিনি পৌরাণিক গ্রন্থের বল জানেন না, মনুষ্য-জীবনের দায়িত্ব তিনি জীবনে বুঝেন নাই।"

"* * * জাতীয় বৃত্তি পরিচালনা ব্যতীত কবিতা বা নাটক জাতীয় হিতকর হয় না, ভারতবর্ষের জাতীয় মর্ম্ম ধর্ম্ম। দেশহিতৈষিতা প্রভৃতি যত প্রকার কথা আছে, তাহাতে কেহ ভারতের মর্ম্ম স্পর্শ করিতে পারিবে না। ভারত ধার্ম্মিক। যাহারা লাঙ্গল লইয়া চৈত্রের রৌদ্রে হল সঞ্চালন করিতেছে, তাহারাও 'কৃষ্ণ' নাম জানে, তাহাদেরও মন 'কৃষ্ণ' নামে আকৃষ্ট। যদি নাটক সার্ব্বজনিক হওয়া প্রয়োজন হয়, 'কৃষ্ণ' নামেই হইবে।"

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গিরিশচন্দ্রের রচিত কতকগুলি নাটকের উল্লেখ করিয়া সেই সকল নাটকে গিরিশচন্দ্রের প্রতিভার স্ফুরণ হইয়াছে বলিয়া স্বীকার

করিয়াছেন। ঐ তালিকাটিকে অধিক বিস্তৃত না করিয়া আমরা উহার সহিত মাত্র কয়েকখানি নাটকের নাম যোজনা করিতেছি। প্রথম অভিনয়ের তারিখ অনুসারে তালিকাটি নিম্নে প্রদত্ত হইল—

*রাবণবধ (১২৮৮), পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস (১২৮৯), দক্ষযজ্ঞ (১২৯০), চৈতন্যলীলা (১২৯১), বুদ্ধদেব-চরিত (১২৯২), বিল্বমঙ্গল ঠাকুর (১২৯৩), রূপ সনাতন (১২৯৪), পূর্ণচন্দ্র (১২৯৪), নসীরাম (১২৯৫), বিষাদ (১২৯৫), প্রফুল্ল (১২৯৬), হারানিধি (১২৯৬), চণ্ড (১২৯৭), ম্যাক্‌বেথ (১২৯৯ ; বহু পূর্ব্বে রচিত), মুকুলমুঞ্জরা (১২৯৯), জনা (১৩০০), *করমতিবাই (১৩০২), *কালাপাহাড় (১৩০৩), *মায়াবসান (১৩০৪), *পাণ্ডবগৌরব (১৩০৬), *ভ্রান্তি (১৩০৯), *সৎনাম (১৩১১), বলিদান (১৩১১), সিরাজদ্দৌলা (১৩১২), মীরকাশিম (১৩১৩), ছত্রপতি শিবাজী (১৩১৪), শাস্তি কি শান্তি (১৩১৫), শঙ্করাচার্য্য (১৩১৬), অশোক (১৩১৭), *তপোবল (১৩১৮), গৃহলক্ষ্মী (১৩১৯ ; দেহত্যাগের পর প্রকাশিত)।

গিরিশচন্দ্রের কয়েকখানি নাটকের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

সংস্কৃত নাটকের প্রথম দৃশ্যে সূত্রধারের মুখে নাটকের মূল কথাটি সূত্রাকারে প্রকাশের রীতি আছে। শেক্সপীয়ারের নাটকেও দেখা যায় প্রথম দৃশ্যটি সমগ্র নাটকখানির মল ভাবটির ছায়া। গিরিশচন্দ্রেরও অনেক নাটকে প্রথম দৃশ্যে নাটকের উপজীব্য বিষয়টির আভাস ফুটিয়া উঠিয়াছে। গিরিশচন্দ্রের 'জনা', 'বুদ্ধদেব-চরিত', 'কালাপাহাড়' প্রভৃতি নাটকের নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে।

জনা

অগ্নি কল্পতরু হইয়া বর দিতেছেন। উপস্থিত সকলে নিজ নিজ বাসনা অনুযায়ী বর লইতেছেন।

"নীলধ্বজ—কল্পতরু যদি তুমি দেব বৈশ্বানর,
দেহ বর,
যেন নটবর, নবঘন-কায়,
বাঁশরী-বয়ান, ত্রিভঙ্গিম-ঠাম
নররূপী নারায়ণে পাই দরশন।

অগ্নি—চিন্তা দূর কর, মহারাজ,
আশা তব অচিরে পূরিবে

জনা—নাহি অন্য বাসনা আমার,
যেন অন্তকালে গঙ্গাজলে
ত্যজি প্রাণবায়ু,
ভাগীরথী পদে মতি রহে চিরদিন।
বাল্যকালে মাতৃহীনা আমি—
মার কোল চিরদিন করি আকিঞ্চন।

অগ্নি—মম বরে পূর্ণকাম হইবে নিশ্চয়।

প্রবীর—তব যোগ্য বীর সনে সদা রণসাধ,
চিরদিন আছে এ বিষাদ,
সমকক্ষ বীর না মিলিল।
বর যদি দিবে বৈশ্বানর,
ভুবনবিজয়ী রথী দেহ মোরে অরি,
মরি কিবা মারি,
মিটুক সমর বাঞ্ছা মোর।

অগ্নি—শীঘ্র তব পূরিবে বাসনা।

স্বাহা—তব পদ বিনা, প্রভু, নাহি অন্য সাধ,
পতিমাত্র গতি অবলার,
তব পদে নিরবধি স্থির রহে মতি।

অগ্নি—প্রেমে বাঁধা প্রণয়িনী আছি তব পাশে;
শুন প্রাণেশ্বরী, কহি সত্য করি,
'স্বাহা' নাম যেই না করিবে উচ্চারণ—
আহুতি গ্রহণ তার কভু না করিব।

* * * *

(রাজার প্রতি)
শুন রাজা,
প্রজাগণে জনে জনে কিবা দিব বর,
নর-রূপী পীতাম্বর আসি এই পুরে,
পূরাবেন বাসনা সবার,
আমিও পবিত্র হব নেহারি শ্রীহরি।

নিজ নিজ কার্য্যে সবে করহ প্রস্থান
ধ্যানে মগ্ন রব সঙ্গোপনে।
[অগ্নি ও বিদূষক ব্যতীত সকলের প্রস্থান]

অগ্নি—কি হে, তুমি যে দাঁড়িয়ে রইলে ?

বিদূষক—তোমার ভাব বুঝ্ছি।

অগ্নি—তুমি তো কিছু চাইলে না ?

বিদূষক—আজ দেখ্ছি তোমার ভারি বাড়াবাড়ি, হরি নিয়ে ছড়াছড়ি; তাই হচ্ছে ভয়, কৃষ্ণ দয়াময়, নাম করলেই হন উদয়,—কিন্তু যেখানে দেন পদাশ্রয়, সেখানে যে সর্ব্বনাশ হয়—একথা নিশ্চয়।"

বস্তুতঃ নাটকীয় ঘটনা-পরম্পরায় শেষ পর্য্যন্ত প্রত্যেকেরই স্ব স্ব অভিপ্রায় সিদ্ধ হইয়াছিল। বিদূষক-চরিত্রের সূচনারও একটি বিশেষ তাৎপর্য্য আছে। বিদূষক ভক্তি ও বিশ্বাসের জীবন্ত প্রতীক। অন্তরে ভক্তি ও বিশ্বাস ব্যতীত ভগবানকে পাওয়া যায় না। সেই কথা বুঝাইবার জন্যই বিদূষক-চরিত্রের অবতারণা। আবার বিদূষকের কথাবার্ত্তার মধ্য দিয়া নাটকের শোচনীয় পরিণতিরও আভাস পাওয়া যাইতেছে। এই নাটকখানির মধ্য দিয়া গিরিশ-চন্দ্র ভক্তিরস পরিবেশন করিয়াছেন।

বুদ্ধদেব-চরিত

'বুদ্ধদেব-চরিতে'র সূচনাতেও বিষ্ণু ও দয়ার কথোপকথনের মধ্যে বুদ্ধদেবের জীবনলীলার তাৎপর্য্যাদি স্বল্পপরিসরের মধ্যে সুন্দরভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

গোলোকধামে লীলাকমলহস্তে বিষ্ণু আসীন, সম্মুখে করযোড়ে দয়া দণ্ডায়মানা। নরলোকে দয়া নিগৃহীতা। নরগণ হিংসাকে আশ্রয় করিয়াছে। বিষ্ণুর নিকট দয়া মুক্তির জন্য প্রার্থনা জানাইতেছেন। বিষ্ণু দয়াকে আশ্বাস দিয়া বলিতেছেন, নরলোকের বৃত্তান্ত তিনি অবগত আছেন। বার বার মানব-কুলের পরিত্রাতারূপে তিনি ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছেন। পনরায় শীঘ্রই তিনি নরলোকে অবতীর্ণ হইবেন।

"বিষ্ণু—নব বিধি করিয়ে প্রচার,
ভ্রম দূর করিব সবার,
'অহিংসা পরম ধর্ম্ম' করিব ঘোষণা।

যুক্তি-বলে বিমুখি' সকলে
জ্ঞান-জ্যোতি করিব বিকাশ।
অজ্ঞানতা তমো হবে নাশ,
যাগ-যজ্ঞ হবে নিবারণ। * * *
দেবার্চ্চনে প্রাণীর হনন
নাহি হবে ধরা মাঝে ;
আত্মোন্নতি করিতে সাধন,
নরগণ করিবে যতন ;
কর্ম্মে কর্ম্মনাশ-আশে,
নির্ব্বাণ-প্রয়াসে
রিপুগণে করিবে দমন,
সদাচারী হইবে মানব।"

কালাপাহাড়

'কালাপাহাড়' নাটকের আখ্যানবস্তুরও একটা পূর্ব্বাভাস ফুটিয়া উঠিয়াছে মুকুন্দদেবের সহিত কালাপাহাড় ও চঞ্চলার কথোপকথনে। বস্তুতঃ সন্দেহ ও অসন্তোষই কালাপাহাড়-চরিত্রের অদ্ভুত পরিণতির কারণ। সংশয়াকুল চিত্তে কালাপাহাড় কল্পতরুব্রতী মুকুন্দদেবের শরণাপন্ন হইয়া আধ্যাত্মিক সংশয়ের নিরাকরণের জন্য প্রার্থনা জানাইলেন। সংশয় দূর করিতে না পারায় অশান্ত হৃদয় কালাপাহাড় অসন্তুষ্ট হইয়া ফিরিয়া গেলেন। নাটকের বীজ এখানেই উপ্ত হইল। ব্রাহ্মণকুমারের প্রণয়ার্থিনী চঞ্চলাও আসিয়াছিল তাহার বাসনা লইয়া, কিন্তু তাহার বাসনা পূর্ণ হইল না। প্রেমের বৈভবে সে ভূত-ভবিষ্যৎ অবগত ছিল। বিদায়ের পূর্ব্বে তাই জিজ্ঞাসিত হইয়া মুকুন্দদেবের কাছে যে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া গেল, তাহাই অক্ষরে অক্ষরে সত্য হইয়াছে সমগ্র নাটকের মধ্যে।

প্রথম দৃশ্যে চঞ্চলার আগমনের উদ্দেশ্য

গিরিশচন্দ্র-রচিত নাটকাবলীর বিস্তৃত আলোচনা বর্ত্তমান ক্ষেত্রে সম্ভব নহে। আমরা কয়েকখানি মাত্র নাটকের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়া নাট্যকার-গিরিশচন্দ্রের প্রসঙ্গ শেষ করিব।

জনা

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সংস্পর্শে আসিয়া গিরিশচন্দ্রের মনের ভাব ধীরে ধীরে বিকশিত হইতে থাকে ; উহারই চরম অবস্থা জনার বিদূষকের চরিত্রের মধ্যে রূপায়িত।

গিরিশচন্দ্রের ভক্তি-বিশ্বাস সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিয়াছিলেন—"গিরিশের ভক্তি-বিশ্বাস পাঁচ-সিকা পাঁচ-আনা।" বিদূষকের চরিত্রের মধ্য দিয়া পরমহংসদেবের এই উক্তির সত্যতা সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হইয়াছে। বিদূষক যাহার যাহার সংস্পর্শে আসিয়াছে, তাহাদের প্রত্যেককেই ভক্তি-বিশ্বাসের সাহায্যে মুক্তির পথে ঠেলিয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছে এবং নিজেও শেষ জীবনে ঐকান্তিক বিশ্বাস ও ভক্তির জোরেই মাহিস্মতিপুরীতে ভগবানের যুগলরূপ-দর্শনলাভে ধন্য হইয়াছে। বিদূষক একটি রসিক চরিত্র ; তাহার সরস সংলাপের মধ্য দিয়া ভক্তির আসল রূপটির আভাস সুন্দরভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। অন্তরে যার বিশ্বাস থাকে, মুক্তি তার হাতের মুঠায়। ভক্তি-বিশ্বাস অন্তরের বস্তু, বাহ্য ব্যবহারের মধ্যে সব সময় উহা ধরা যায় না। বিদূষক-চরিত্রটি এই আন্তরিক ভক্তি-বিশ্বাসের একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত

অগ্নি বিদূষককে বলিতেছেন—"আচ্ছা, তোমার রাজার জন্য এত দরদ, তোমার আপনার দশা কিছু ভাব না ?"

বিদূষক তদুত্তরে বলিতেছেন—"আরে দেবতা, ওই যে তোমার ঠেলায় পড়ে বিশ বার 'হরি হরি' বল্লুম, একবার নাম কল্লে ত'রে যায়। আমার উপায় হ'য়েছে, তোমায় ভাবতে হবে না।"

বাহ্যতঃ কৃষ্ণনিন্দা করিলেও অন্তরে অন্তরে কৃষ্ণভক্তি তাহার প্রগাঢ়। কৃষ্ণের লীলাপ্রসঙ্গ উল্লেখ করিতে সে আনন্দ পায়, তাই নিন্দার অছিলায় সে বার বার কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিয়াছে। একবার নাম করিলে তরিয়া যায়—এ বিশ্বাস তাহার মধ্যে অটুট বলিয়াই অগ্নি বলিতেছেন—

"এক নামে মুক্তি পায় নরে,
এ বিশ্বাস হৃদে যেই ধরে,
এ ভব-সাগর গোষ্পদ সমান তার।"

জনার আখ্যানভাগ মহাভারতের অন্তর্গত। এই নাটকের প্রধান চরিত্র 'জনা' হইলেও মহাভারতের নায়ক শ্রীকৃষ্ণের এখানেও প্রাধান্য। তাঁহার ইঙ্গিতেই সমস্ত ঘটনার উত্থান-পতন। শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্য ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা

এবং সেই ধর্ম্মরাজ্যের একচ্ছত্র অধীশ্বর হইবেন যুধিষ্ঠির; অতএব পাণ্ডবদের সমকক্ষ বীর বর্ত্তমান থাকিতে ধর্ম্মরাজ্যের সুপ্রতিষ্ঠা হইতে পারে না।

প্রবীর বীরত্বে কাহারও অপেক্ষা ন্যূন নহে। তাহাকে জিয়াইয়া রাখিয়া যুধিষ্ঠিরকে নিষ্কণ্টকে ধর্ম্মরাজ্যের রাজা করা যায় না। তাই অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন করিয়া, প্রবীরের সঙ্গে যুদ্ধ এবং ছলে-বলে-কৌশলে প্রবীরকে পরাজিত করা কৃষ্ণেরই চক্রান্ত। শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—

"ধরিয়াছি নরদেহ ধরার রোদনে।
না করিলে মমতা বর্জন,
ধর্ম্মরাজ্য ভারতে না হইবে স্থাপন।
মহাবীর প্রবীর না পতন হইলে,
পাণ্ডবের সমকক্ষ বীর রবে ভবে।
করিয়াছি ভাগিনা ছেদন,
নিজ কুল করিব নিধন,
যুধিষ্ঠির সুশাসন ভারত মানিবে।
নীর হেরি নারী চক্ষে, দয়া না করিব—
প্রবীরে বধিব,
শুনি মম নাম গান,
সদয় হৃদয়—পার্থ নাহি প্রবীরে নাশিবে;
বৈষ্ণবী মায়ায় মুগ্ধ গঙ্গার কিঙ্কর
হরিতে নারিবে বাজী।
ছলে ভুলাইয়ে ফিরাইব বামাদলে।"

এই নাটকে প্রতিদ্বন্দ্বী দুই দলের মধ্যে এক দিকে ক্ষত্রিয়ত্বের অভিমানী মহাবীর প্রবীর ও তাহার জননী জনা, অন্য দিকে নরনারায়ণ—অর্জুন জনার্দ্দনের শ্রীচরণাশ্রিত ভুবনবিজয়ী বীর, উভয় পক্ষই ধর্ম্মের আশ্রিত বটে, কিন্তু প্রবীর শ্রীকৃষ্ণকে নারায়ণ জানিয়াও নিজ ক্ষাত্রধর্ম্ম বলি দিতে প্রস্তুত নহে।

"প্রবীর—অহংকারে ধরিয়াছি ঘোড়া,
প্রাণভয়ে দিব ছেড়ে?
সম্মুখ সংগ্রামে পাণ্ডবে না ডরি,
নাহি ডরি নারায়ণে।
মদনমঞ্জরী—ক্ষম দোষ, পাণ্ডব-সহায় হরি,
ডরি পাছে রুষ্ট হন জনার্দ্দন।

প্রবীর—নিজ ধর্ম্ম করিলে সাধন,
রুষ্ট যদি হন জনার্দ্দন,
নারায়ণ কভু তিনি নন।
ধর্ম্মের স্থাপন হেতু হন অবতার ;
নিজ ধর্ম্মে রুচি আছে যার,
তার প্রতি বহু প্রীতি তাঁর ;
তবে কেন ভাব অকারণ ?
ধনু-করে ক্ষত্রিয় শমনে নাহি ডরে।"

প্রবীর মাতৃভক্ত পুত্র। সর্ব্ব ব্যাপারে মাতৃ-আজ্ঞা তার শিরোধার্য্য। পিতা যখন তাহাকে ঘোড়া ফিরাইয়া দিতে আদেশ করিলেন, তখন অভিমানী প্রবীর মাতৃসকাশে আসিয়া অতিশয় কাতরভাবে জানাইল সে ঘোড়া ফিরাইয়া দিবে, কিন্তু ক্ষত্রিয়ত্বের অপমান সহ্য করিতে পারিবে না, সে মৃত্যুবরণ করিবে। জননী তাহাকে অনেক বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন, বলিলেন—বলবানে পূজা দেওয়ার নিয়ম আছে, নরনারায়ণ ধনঞ্জয় প্রবল প্রতাপ বীর। তাঁহাকে সম্মান-প্রদানে কোন লজ্জা নাই। কিন্তু প্রবীর স্বীয় ক্ষাত্রধর্ম্মের অবমাননা স্বীকার করিয়া লইতে রাজী নহে। জননীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"শুনি, মাতা, জাহ্নবীর বরে
পাইয়াছ মোরে ;
কাপুরুষ পুত্র কি দেছেন ভাগীরথী ?
রণে যদি না যাই, জননি,
দেবতার হবে অপমান।"

পাছে কোন অকল্যাণ হয় এই ভয়েই জনা পুত্রকে যুদ্ধে যাইতে নিষেধ করিয়াছিলেন, কিন্তু পুত্রের দুর্দ্দমনীয় ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ করিতে তিনি আর পারিলেন না। তিনি ক্ষত্রিয় রমণী, বীর জননী, পুত্রকে প্রতিশ্রুতি দিলেন রাজাকে বুঝাইয়া তিনি সমস্ত ব্যবস্থা করিবেন।

"স্থির হও, আমি বুঝাইব ভূপে।
হয় হোক্ যা আছে মা জাহ্নবীর মনে,
রণ-সাধ যদি তোর, রণ পণ মম।"

জনা যুদ্ধে সম্মতি দিতে রাজাকে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। রাজা কিছুতেই রাজী হন না—"জেনে শুনে নারায়ণে না করিব অরি।" দাম্ভিক

ধনঞ্জয়কে পরাজিত করিবার জন্য পুত্র আগ্রহশীল। "যদি হয় জয়, পূজা লোকময় পাইবে নন্দন মম।" অতএব উচচ কার্য্যে ব্রতী পুত্রকে জনা কিছুতেই নিবারণ করিবেন না। তিনি শুধু রাজার অনুমতি প্রার্থনা করেন—

"জনা—দেহ আজ্ঞা, যাব রণে নন্দনে লইয়ে,
আজ্ঞামাত্র চাই ;—
এক গোটা পদাতিক সঙ্গে নাহি লব ;
তনয়ে করিব রথী, সারথি হইব,—
নারায়ণে ভেটিব সম্মুখ-রণে।
নারায়ণ অরিরূপী যার,
করগত গোলক তাহার।
*　　*　　*　　*
যথা ইচ্ছা কর নরপতি,
পতি তুমি কত আর কব,
রণে যেতে পুত্রে কভু আমি না বারিব।"

সুতরাং প্রবীরের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ অনিবার্য্য হইয়া উঠিল এবং সেই যুদ্ধ-পরিচালনার কার্য্যে প্রধান অংশ গ্রহণ করিলেন জননী জনা।

প্রবীর ক্ষাত্রধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য স্বয়ং নারায়ণের সহিত বৈরিতা করিতেও পশ্চাৎপদ নহেন। দেববলে বলী অর্জুন বাজী ফিরাইয়া দিতে অনুরোধ করিলে প্রবীর তাহাকে সুস্পষ্টভাবে জানাইয়া দিল—

"অশ্ব দিব ফিরাইয়ে পরাজয় মানি,
ভেব না সম্ভব কভু।
দেবতার বলে যদি বলী তুমি আজি,
দেব-রোষ যদি মম প্রতি,
ক্ষত্রিয়-শোণিত বহে ধমনীতে মম,
রণে নাহি দিব ক্ষমা।"

এই ক্ষত্রিয়ত্বের অভিমানই প্রবীরের পতনের অনিবার্য্য কারণ। এই অভিমানই তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণের সহিত বৈরিতা করিতে প্ররোচনা দিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে যুদ্ধ হইতে ক্ষান্ত হইবার জন্য অনেক বুঝাইয়াছেন, কিন্তু প্রবীর তাঁহার উপদেশে আস্থা স্থাপন করিতে পারে নাই ; কপটের শিরোমণি বলিয়া শ্রীকৃষ্ণকে গালি দিয়াছে।

"জগবন্ধু নারায়ণ, যদি হে কেশব।
একের কি হেতু বন্ধু, বৈরী অপরের?
পাণ্ডবের সখা, আর নহ সখা কার?"

রণক্লান্ত প্রবীরকে শ্রীকৃষ্ণ আবার অনুরোধ করিলেন—বাজী প্রত্যর্পণের জন্য। শ্রীকৃষ্ণ আশ্বাস দিলেন, ইহাতে তাঁহার মর্য্যাদা বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হইবে না—

"রাখ রাখ, রাজপুত্র বচন আমার,
অশ্বমেধ-অনুষ্ঠান মম উপদেশে,
রাখ অনুরোধ,
পার্থে দেহ ফিরাইয়ে বাজী;
মম কার্য্যে বিঘ্ন নাহি কর।
তোমা দোঁহে কেহ নহে ঊন।
সমরে সোসর তুমি বীরবর,
কীর্ত্তি তব রবে লোকময়,
করি রণজয়
হয় দেহ ফিরাইয়ে আমার বচনে।
অপযশ কভু তব হবে না কুমার।"

প্রবীর এই অনুরোধও উপেক্ষা করিল। প্রবীর ছিল অতুলনীয় পরাক্রমশালী বীর। তাহার অসামান্য বীরত্বের কথা ভীমের মুখ দিয়া ব্যক্ত হইয়াছে।

"রামজয়ী পিতামহে দেখেছি সমরে,
ধনুর্ব্বেদ দ্রোণ সনে করিয়াছি রণ
কিন্তু এ হেন বিক্রম
মানবে সম্ভব কভু নাহি ছিল জ্ঞান।"

অর্জ্জুন বলিয়াছেন—

"বীর্য্যবান্ রথিশ্রেষ্ঠ তুমি হে কুমার,
প্রকাশিলে অতুল বিক্রম
তোমা সম বীর নাহি ত্রিভুবনে
*　　*　　*　　*
কৃষ্ণসনে অর্জ্জুনে জিনেছ রণে।"

প্রবীরের এই অপরিমেয় শক্তি ও বীরত্বের মূলে ছিল তাঁহার মাতৃভক্তি।

"দেব-বরে দেব-অংশে জন্মেছে কুমার,
দেবের প্রসাদে
মাতৃভক্তি অপার তাহার।"

মায়ার ছলনায় যেদিন সে মাতৃপদধূলি গ্রহণ করিতে বিস্মৃত হইল, সেই দিনই হইল তাহার পরাজয়। প্রবীরের প্রসঙ্গে গিরিশচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের মুখ দিয়া মাতৃভক্তির অলৌকিক মহিমার কথা ব্যক্ত করিয়াছেন—

"সত্য কহি, শক্তি নাহি ধরে ষড়ানন—
বিমুখিতে মাতৃভক্ত যোধে।
মাতৃ-পদধূলি বীর নিত্য ধরে শিরে,
ম্রিয়মাণ ডরে মম চক্র আসে ফিরে,
পাছে ভস্ম হয়।
মাতৃভক্ত মহাতেজা,
প্রবীরে নিবারে বীর নাহি ত্রিভুবনে।"

জনার বীরত্ব তার চরিত্রের সর্ব্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য হইলেও কোমলে কঠোরে মিশিয়া উহা এক অপূর্ব্ব সত্তা লাভ করিয়াছে। "বীর মাতা হ'য়ে বীরশ্রেষ্ঠ পুত্রের গৌরবপথে কি কণ্টক হব"—এই মনোভাবই নাটকটিকে ঘটনা-পরম্পরায় পরিণতির দিকে টানিয়া আনিয়াছে। "প্রাণ তুই বক্ষ বিদীর্ণ হয়ে বাহির হ', ক্ষতি নাই; আমি পণ করেছি রণ রণ রণ—স্বয়ং জাহ্নবীর কথাতে বারণ হবে না।" পুত্রের অমঙ্গল আশঙ্কায় তার বক্ষ দুরু দুরু, কিন্তু তবু ক্ষত্রিয়-নন্দিনী সে, ক্ষত্রিয়ের ঘরণী, ক্ষত্রিয়ের জননী, দুর্ব্বলতাকে সে কিছুতেই প্রশ্রয় দিবে না। ভয়ভীতা পুত্রবধূকে সে উৎসাহ দিতেছে—

"জন্মিয়াছ ক্ষত্রিয়ের কুলে,
মালা দেছ ক্ষত্রিয়ের গলে,
রণ শুনি বিষণ্ণ হ'য়ো না বালা।
ক্ষত্রিয়ের নিত্য বাধে রণ,
জয় পরাজয়—
যুদ্ধে কিছু নাহিক নিয়ম;
বীরাঙ্গণা পতিরে না বারে রণে যেতে।

* * *

ত্যজি ভয়, ক্ষত্রিয় তনয়া
উচ্চ কার্য্যে স্বামীরে উৎসাহ কর দান।"

মন্ত্রী, সেনাপতি ও সেনানায়কগণ কৃষ্ণের বিপক্ষে সংগ্রামে অবতীর্ণ হইতে অনিচ্ছুক। তাহারা শিবিরে পরস্পর আপন আপন কর্ত্তব্য সম্পর্কে আলোচনা করিতেছে। প্রভাত হইবামাত্র শত্রুপক্ষ শিবির আক্রমণ করিবে, কিন্তু বাধা দেওয়ার কোন ব্যবস্থাই তাহারা করে নাই। এমন সময় বীরদর্পে চামুণ্ডার মত ছুটিয়া আসিল জনা। সহস্র ধিক্কা র তাহাদের সুপ্ত বীরত্ব জাগাইয়া তুলিল—

"মরণে কি মন্ত্রী এত ভয়?
রণমৃত্যু না হ'লে কি এড়াবে শমন?
* * *
অমর কি জন্মেছে পাণ্ডব?
* * *
বীরদম্ভে বিমুখ পাণ্ডবে,
কিবা ভয়—
রণজয় হইবে নিশ্চয়।
জাহ্নবীর বরে মম প্রবীর কুমার,
কুমার সমান শক্তিধর;
আগুয়ান তার বাণে কে হবে সংগ্রামে?"
* * *

নগরে সকলেই নিরুৎসাহ, কোথাও যুদ্ধের উন্মাদনা নাই; একা জনা অনন্য-চিত্ত হইয়া সকলকে উৎসাহ দান করিয়াছে। নারীর পক্ষে ঈদৃশ বীরত্ব অতুলনীয়।

জনার অতুলনীয় বীরত্বব্যঞ্জক কার্য্যকলাপের মধ্যে প্রচ্ছন্ন মাতৃস্নেহের কিছু কিছু আভাস পাইলেও, এতক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার পূর্ণ প্রকাশ দেখা যায় নাই। যুদ্ধক্ষেত্র হইতে প্রবীরের প্রত্যাবর্ত্তনে বিলম্ব দেখিয়া, এই বীরাঙ্গনার হৃদয় সেদিন সাধারণ মায়ের মতই উদ্বেগপূর্ণ। কুমারের তত্ত্ব লইবার জন্য ব্যাকুল অন্তরে রাজাকে অনুরোধ করিতেছে,—

"চল, রাজা, যাই দুই জনে—
ভ্রমি বনে বনে 'প্রবীর' বলিয়ে ডাকি
শোনে যদি আমার বচন
* * *

'মা' বলে আসিবে ধেয়ে।

*　　*　　*

চল, রাজা, চল, চল—যাই দুই জনে,
নিশ্চয় সে করিয়াছে অভিমান,
অভিমান কথায় কথায় তার।"

চতুর্দ্দিকে অমঙ্গলের চিহ্ন, রোদনের ধ্বনি, ভীষণ ভৈরবীমূর্ত্তি দর্শন করিয়া স্বয়ং অগ্নি সভয় অন্তরে ফিরিয়া আসিয়াছে। কিন্তু জননী তাহার পুত্রের অন্বেষণ না করিয়া কিছুতেই নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারে না। গঙ্গার পূজা করিয়া সে একা যাইবে পুত্রের সন্ধানে

"শাবকের অন্বেষণে সিংহিনী যাইবে

*　　*　　*

যাব পুত্র অন্বেষণে কে বিরোধী হবে?"

রণরঙ্গিণী মূর্ত্তির মধ্যে যে মাতৃস্নেহ আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, সেই মাতৃস্নেহই আবার নূতনরূপে আত্মপ্রকাশ করিল। প্রবীরের অন্বেষণে আসিয়া জননী দেখিল প্রবীর যুদ্ধে নিহত; তখনই তাহার অন্তরে প্রতিহিংসার দাবানল জ্বলিয়া উঠিল। কুমারের জন্য শোক করিবার তার অবসর নাই, অচিরে পুত্রহন্তার বিনাশসাধনই এখন তাহার একমাত্র লক্ষ্য।

"শোণিতের সনে বহ গরল প্রবাহ,
বৈশ্বানর খেল শ্বাস সনে,
পুত্রহন্তা বৈরীরে নাশিতে।
চক্ষু হ'তে প্রলয় অনল ছোট—
হিংসা তৃষা শুষ্ক কর হিয়া,
কক্ষচ্যুত হও দিনকর,
উঠরে প্রলয়ধূম বিশ্ব আবরিতে,
পুত্রঘাতী অরাতি জীবিত।"

তবুও মায়ের প্রাণ থাকিয়া থাকিয়া কাঁদিয়া উঠিয়াছে, কিন্তু সে কান্না তাহাকে অভিভূত করিতে পারে নাই, সেই সন্তাপ তাহাকে সঙ্কল্প হইতে দূরে সরাইয়া লইতে পারে নাই; প্রতিহিংসার প্রবৃত্তিকে শতগুণ বাড়াইয়া দিয়াছে—

"জ্বলরে সন্তাপ হৃদে জ্বলরে দ্বিগুণ
জ্বালা জুড়াইবে জনা শত্রুর শোণিতে।"

জনা ছুটিয়া চলিয়াছে পুত্রহত্যার প্রতিশোধ লইতে। যাওয়ার পূর্ব্বে ভূমি-শয্যায় শায়িত পুত্রকে একবার নিরীক্ষণ করিতে আসিয়াছে। সে সময়ের চিত্রটি কত করুণ, কত মর্ম্মান্তিক।

"দেখে যাই শেষ দেখা ;
আহা বাপধন,
পলক প'ড়ে না চোখে নেহারি বাছারে।"

মদনমঞ্জরীকে বিলাপ করিতে দেখিয়া জনা তাহাকে বলিতেছে—

"কাঁদ উচ্চৈঃস্বরে শোক কর বালা,
শোক নাহি জনার হৃদয়ে।
* * *
তীক্ষ্ণ অস্ত্রধার বেজেছে বাছার কায়
বুঝি মর্ম্মস্থল জ্বলে,
কর তায় ধারা বরিষণ।
কাঁদ কাঁদ বালা, পতি তোর ধরাতলে ;
রুধিরতৃষায় জ্বলে জনার অন্তর।"

এই প্রতিহিংসাপরায়ণ উন্মাদিনীর চিত্রটি গিরিশচন্দ্রের তূলিকায় অপূর্ব্বভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। রাজা নীলধ্বজ পাণ্ডবের কৃপায় কৃষ্ণের দর্শন পাইবেন, অকারণ প্রজা নাশ করার অভিপ্রায় তাঁর নাই, তিনি রাণীকে শান্ত হইতে বলিতেছেন, কিন্তু "শান্ত কভু নাহি হয় পুত্রশোকাতুরা।"

"জনা—শান্ত? শান্ত হবে পুত্রশোকাতুরা?
ধরা যদি পশে রসাতলে.
কক্ষচ্যুত হয় গ্রহ তারা,
নিভে দিনকর,—
প্রবল আঁধারে ঘেরে যদি বিশ্ব আসি,
জ্বলে যদি ক্ষীরোদ অনলে
অষ্ট বজ্র চলে,
বিশ্বচূর্ণ পরমাণুরূপে,
শান্ত কভু নাহি হয় পুত্রশোকাতুরা।

প্রতিহিংসা তৃষা মিটাইব অরির শোণিতে।
দেখিবে জগতে
পুত্রশোকাতুরা নারী ভীষণা কেমন।
*   *   *
চলে জনা প্রতিবিধিৎসিতে।"

জনা পাগলিনীর মত বনে বনে পথে পথে ছুটিয়া বেড়াইতেছে। পুত্রহত্যার প্রতিশোধ না নেওয়া পর্য্যন্ত সে ক্ষান্ত হইবে না। ভ্রাতা উলুক তাহাকে সান্তনা দিতে কত চেষ্টা করিল, কিন্তু সবই বৃথা।

"শমনের কঠিন দুয়ার
শোকে কি খুলিবে ?"

উলুকের এই কথায় জনার মাতৃহৃদয় উদ্বেল হইয়া উঠিল। সে যে মা। যেদিন হইতে মা পুত্রকে জঠরে ধারণ করে সেইদিন হইতে প্রতিটি দিনের স্মৃতি তার অন্তরে গাঁথা হইয়া থাকে। পুত্র শত্রুর অস্ত্রাঘাতে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। পতিপ্রাণা পুত্রবধূ শোকে লুটাইয়া পড়িয়াছে। মায়ের মন কিরূপে সান্ত্বনা লাভ করিবে।

"জান না,—ধর নি গর্ভে তারে
জান না,—জান না,
কি বেদনা বেজে আছে বুকে।"

পুত্রবধের প্রতিশোধ লইতে না পারিয়া জনা অবশেষে ভাগীরথীর জলে আত্ম-বিসর্জন করিয়া তাহার হৃদয়ের সকল জ্বালা উপশম করিল।

বীর ও করুণ বসের এমন অপূর্ব্ব সমন্বয় অন্য কোন নাট্যকারের দ্বারা সম্ভব হইয়াছে কি না সন্দেহ। গাম্ভীর্য্যপূর্ণ শব্দ ও ছন্দ নাটকখানির বিশিষ্টতা সম্পাদন করিয়াছে।

কালাপাহাড়

গিরিশচন্দ্রের 'কালাপাহাড়' নাটকের প্রধান চরিত্র কালাপাহাড় হইলেও তাহার চিন্তামণি (যাহা পরমহংসদেবের জীবনের ছায়া লইয়া গঠিত) চরিত্র সর্ব্বাপেক্ষা উজ্জ্বল ও নাটকের প্রয়োজনের দিক হইতে অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ। নাটকের অন্যান্য যে সকল চরিত্র নিজ নিজ অভিপ্রায় সিদ্ধির জন্য এই চরিত্রের সংস্পর্শে আসিয়াছে তাহাদের সকলকেই তিনি প্রেয় অপেক্ষা শ্রেয়ের পথে

টানিয়া আনিতে চেষ্টা করিয়াছেন। সংসার-তাপদগ্ধ নরনারী নিজ শ্রেয় কোন্‌টি জানিতে না পারিয়া স্বার্থপ্রণোদিত প্রেয়কেই লাভ করিবার জন্য ব্যস্ত ; কিন্তু সব সময়ই ব্যর্থমনোরথ হইয়া, তাহারা নৈরাশ্যের অকূল পাথারে দিশাহারা হয় এবং 'হা-হুতাশ' করিতে থাকে। সেই অবস্থা হইতে পরিত্রাণ করিবার জন্য শ্রীভগবান্‌ ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরুরূপে তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত হন। কিন্তু উদ্ভ্রান্ত নরনারী তাঁহাকে দেখিয়াও চিনিতে পারে না।

গিরিশচন্দ্রের চিন্তামণি সকল সময়ই অন্যান্য পাপীতাপীর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া, তাহাদের ভ্রান্তি ও সংশয় নিরশনের জন্য চেষ্টা করিয়াছেন ; কিন্তু তাহারা চিন্তামণিকে চিনিতে পারে নাই। সংশয়ের দুঃসহ জ্বালায় যখন তাহারা দগ্ধ হইতে থাকে, তখন তাহাদিগকে ত্রাণ করিবার জন্য চিন্তামণি নিজে সকল জ্বালা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত। চতুর্থ অঙ্কের ষষ্ঠ গর্ভাঙ্কে চঞ্চলা যখন বলিল,—"জ্বল্‌ছি, জ্বল্‌ছি, জানিস্‌ তো" তখনই চিন্তামণি বলিয়া উঠিলেন,—"ওরে যাস্‌নে যাস্‌নে, দে তোর জ্বালা আমায় দে।"

কালাপাহাড় যখন মর্ম্মন্তুদ যাতনায় অস্থির হইয়া বলিয়া উঠিল,—"ওহো হো, বড় জ্বালা", তখনই চিন্তামণি বলিয়া উঠিলেন,—"তোমার জ্বালা আমায় দাও।" (৫ম অঙ্ক, ২য় গর্ভাঙ্ক)

আত্মাপরাধে অনুতপ্ত বীরেশ্বর যখন বলিতে লাগিল,—"বোধ হয় তুষানলে অনুতাপানল নির্ব্বাণ হবে না। অন্তরে, বাহিরে, শিরায়, মর্ম্মে পাপস্মৃতি জ্বল্‌ছে" তখনই চিন্তামণি অভয় দিয়া বলিলেন,—"ভয় কি ? তুমি তোমার পাপ আমায় দাও।"

(৪থ অঙ্কের ২য় গর্ভাঙ্কে) চিন্তামণি বলিতেছেন,—"আমি মানুষ হ'য়ে মানুষের যন্ত্রণা বুঝেছি, আমি বুঝেছি যে, দিন-রাত্রি মানুষকে ত্রিতাপের তপ্ত-খোলায় ভাজ্‌ছে, আমার কায়মনোবাক্যে কামনা, যদি শত সহস্র জন্ম যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়, তাও ভাল, যদি আমি একজনকে ত্রিতাপ থেকে পরিত্রাণ করতে পারি, তাহলে আপনাকে ধন্য জ্ঞান করবো। এই আমার মন্ত্র, এই আমার শক্তি, এই আমার সাধনা।" ঈশ্বর সকল ধর্ম্মেই এক ; সকল ধর্ম্মের প্রতি চিন্তামণির সমান শ্রদ্ধা, কারণ, "যত মত তত পথ"। যে যে-নামে ঈশ্বরকে উপাসনা করে না কেন, তাহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে। (৩য় অঙ্ক, ৬ষ্ঠ গর্ভাঙ্ক)—

"চিন্তামণি—এক বিভু বহু নামে ডাকে বহুজনে,
যথা জল, একোয়া, ওয়াটার, পানি,
বোঝায় সলিলে, সেই মত আল্লা, গড্‌,

ঈশ্বর, জিহোবা, যীশু নামে নানা স্থানে
নানা জনে ডাকে সনাতনে। ভেদজ্ঞান
অজ্ঞান লক্ষণ, ভেদ-বুদ্ধি কর দূর!
বহুনাম—প্রতিনাম সর্ব্বশক্তিমান্,
যার যেই নামে প্রীতি, ভক্তির উদয়,
প্রফুল্ল হৃদয়, যেই নামে মনস্কাম পূর্ণ,
সেই জন সেই নাম উচ্চারণে।
*   *   * ”

সত্ত্ব, রজঃ, তম—এই তিন গুণের তারতম্য হইতেই বিভিন্ন জাতির উদ্ভব হইয়াছে। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ব্যবধান, আচার-ব্যবহার বা সংস্কারগত, কিন্তু মানুষ হিসাবে সকলেই এক। চিন্তামণির ইহাই অভিমত।

“যার যেই সংস্কার
আচার ব্যবহার, জন্ম তার তদাচারী
কুলে। সংস্কার মত জীবের জনম,
জেনো স্থির। হিন্দুর সমান সত্ত্বগুণী
মুসলমান, ম্লেচ্ছাধিক হিন্দু তমোগুণী
আচার ব্যাভার জাতি কুলের লক্ষণ।”

বলা বাহুল্য, চিন্তামণি ঘৃণা, লজ্জা, ভয় এবং অহংভাব শূন্য হইয়াও লোকের শিক্ষার জন্যই লোকাচারের পোষকতা করিয়াছেন। অজ্ঞানের লোকাচার-বিসর্জন স্বার্থপ্রণোদিত, এইরূপ কার্য্য অতিশয় ঘৃণ্য। কিন্তু চিন্তামণির এই বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও তিনি সকলের অন্নগ্রহণ করিতেন না। তিনি লোকাচারে আস্থাবান। “বামুনের ভাত না হলে কেন খাও না”—লেটোর এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলিতেছেন—

“যদি কেহ শক্তিমান্ সুমেরু লঙ্ঘনে,
সাগর-শোষণে-ক্ষম; আজ্ঞা যদি চন্দ্র
সূর্য্য গ্রহগণে মানে, পবন-গমন
যদি বারে, লোকাচার উচিত রক্ষণ।
যবে জন্মে জ্ঞান, জাতি অভিমান নাহি
রহে, খসে পড়ে পাকা ফল। ঘৃণা, লজ্জা,
ভয়,—জ্ঞানবলে পরাজয় করিয়াছে

যেই মহাশয়, অহঙ্কার-শূন্য জন,
তার নাহি জাতির বিচার। কিন্তু যেই
অজ্ঞান অধম, করে ইন্দ্রিয় তৃপ্তির
হেতু জাতি বিসর্জন, হেয় সে পামর।
তমোগুণে তমোগুণী ভোগের প্রয়াসী।"

'আত্মানং বিদ্ধি'—উপনিষদের এই মহাবাণীই চিন্তামণির জীবনের মূল মন্ত্র। আত্মজ্ঞান জন্মিলে ব্রহ্মাণ্ডের সকল রহস্য পরিষ্কার হইয়া যায়—কালাপাহাড়কে এই শিক্ষাই দিতেছেন। নিজেকে চেন—এইটাই ছিল চিন্তামণির জীবনের বড় কথা। তিনি নিজেও আত্মদর্শী ছিলেন এবং আত্মদর্শনই যে সকল জ্ঞানের সার, সে কথাই তিনি প্রচার করিয়াছেন।

কালাপাহাড় ভগ্নোদ্যানে বসিয়া চিন্তামগ্ন। তিনি ভাবিতেছেন—

"কোথায় স্থানের সীমা!
কতই বিস্তার দশ দিশি!
কালের জনম কোথা,
কোথা কালের গমন স্থির!
নিবিড় তিমির! নিবিড় তিমির!
রুদ্ধশ্বাস বৃথা ধ্যানে হতাশ চিন্তায়!
দেহ কিবা, মৃত্যু কিবা, কিবা এ সংসার!

* * *

কোথা কেবা—কে কবে আমারে?
সত্য কিবা মিথ্যা নারি করিতে নির্ণয়।
ভ্রান্ত, ভ্রান্ত শাস্ত্রকার!
অভিপ্রায়হীন এ সংসার!
অকস্মাৎ—স্রষ্টাহীন—সংযোগ
বিয়োগ বিশ্বকালে অনিশ্চিত, অনিশ্চিত—
বুদ্ধি পরাজয়, নির্ণয় না হয়।
হায় কে আছ কোথায়!"

চিন্তামণি প্রবেশ করিয়া বলিলেন,—

"ওঃ ঠাকুর, বড় বেজার দেখ্‌চি যে!

কালাপাহাড়—কে আপনি?

চিন্তা—কে আমি? ওঃ বড় সোজা কথাটা জিজ্ঞাসা করেছো, না?

কালাপাহাড়—কেন মশাই?

চিন্তা—কেন? তুমি বল দেখি, তুমি কে? বল—বল। * *

কালাপাহাড়—সত্য, আমি কে?

চিন্তা—একটি মজা দেখেছো ভাই, প্যাঁজের খোসা, ছাড়াতে ছাড়াতে আর কিছু থাকে না, আর পুঁটুলি সুঁটুলি হ'য়ে প্যাজটি হ'য়ে আছে—তেমন 'আমি'। খোসা ছাড়িয়ে যাও 'আমি' খুঁজে পাবে না, আর হুঁ—'আমি' বলে দিন-রাত গর্জাচেছ—'অহং অহং'। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে নিঃশ্বাস প'ড়ছে—'ওহম্'। লোকে আপনাকে চেনে না, আর জান্‌তে চায় কি জান? কবে সৃষ্টি হ'লো, কেন সৃষ্টি হ'লো, কোথায় সৃষ্টির শেষ, কোথায় আগা, কোথায় পেছু।"

কালাপাহাড় চিন্তামগ্ন—

"'আমি'—সত্য,—'আমি' কিবা না হয় নির্ণয়।
একি পাঞ্চভৌতিক সংযোগ? চূর্ণ যথা
সলিল সংযোগে করে উত্তাপ উদ্ভব:
ভূত-সম্মিলনে একি চৈতন্য-বিকাশ?
জড় হ'তে চৈতন্য উদয়, জড়ে ছিল
চৈতন্য নিহিত, জড় বৃক্ষে তবে কেন
না ফলে চেতন? জীবসৃষ্টি হেরি মাত্র
জীবের সংযোগে। কিবা জড় চৈতন্য বা
কিবা? কিবা স্বপ্ন, কিবা জাগরণ? চক্ষু,
কর্ণ আদি ইন্দ্রিয় সকল কিবা? দেখি
যাহা, কেন সত্য মানি? ইন্দ্রিয়ে প্রত্যয়
কি কারণে? চক্ষু, কর্ণে, ঘ্রাণে, আস্বাদনে,
স্পর্শে ভ্রম হেরি পদে পদে; তবে কিসে
ইন্দ্রিয়ে বিশ্বাস? পঞ্চেন্দ্রিয় ভোলে, পাঁচে
মিলি ভ্রম নাহি বলে, কোন যুক্তিবলে
সত্য মানি ইন্দ্রিয় বচন? কিসে করি
সত্য নিরূপণ? কোথা সত্য, এস হৃদি
মাঝে। এস, এস, দেখা দাও অভাগায়।"

ব্রহ্মই জগতে বহুরূপে বিরাজমান। ব্রহ্ম প্রকৃতির সাহায্যে জগৎ সৃষ্টি করেন। প্রকৃতি বা ব্রহ্মশক্তি ও পরম ব্রহ্মে পরস্পর নিরবচ্ছিন্ন। সাধারণ মানুষ নিজ সীমাবদ্ধ মনের মধ্যে ব্রহ্মকে আঁকড়াইয়া ধরিতে পারে না। আধিকারিক পুরুষ নিজেকে চিনিয়া ব্রহ্মকে চিনিতে পারে ; কিন্তু আধিকারিকের মনের অবস্থা সব সময় স্থির থাকে না ; সংসারে বিচরণ করিতে গেলে সেই অবস্থা হইতে নামিয়া আসিতে হয়। কারণ, সেই অবস্থায় মন সমাধিস্থ হইয়া যায়। শাস্ত্রে বলে, "ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি।" জগদ্বৈচিত্র্যের পশ্চাতে যে গূঢ় রহস্য আছে, চিন্তামণি সাধনবলে সেই রহস্য ভেদ করিতে পারিয়াছিলেন। সাধারণ মানুষের মধ্যে সাধারণভাবে বিচরণ করিলেও, তাঁহার মধ্যে মধ্যে বেহুঁস অবস্থা ঘটিত। এইরূপ অবস্থারই নাম সমাধি। নবাব সলিমান ও চিন্তামণির কথাপকথনের মধ্য হইতে চিন্তামণির এই সমাধি অবস্থার একটি সুন্দর চিত্র নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

"সলিমান—তোম্ কোন্ ?

চিন্তা—আমি ? কোন্ আমি ? কাঁচা আমি, না পাকা আমি ?

সলিমান—কাঁচা-পাকা কেয়া ?

চিন্তা—কাঁচা আমি কি জান ? আমার গৌড়ে জন্ম, বামুনদের বাড়ি ; নাম কালীকৃষ্ণ, ঘুরে ঘুরে বেড়াই, যা পাই তাই খাই, যেখানে কেউ কিছু না বলে পড়ে থাকি। আর পাকা আমি কি জান ? তাঁর দাস আমি, তাঁর অংশ আমি, তাঁর স্বরূপ আমি। আর ব'লতে পারবো না, তাহ'লে হুঁস থাকবে না।

সলিমান—তুমি মোসাফের ?

চিন্তা—এখন আর কিছুই ঠাওর পাচ্ছিনি। হারিয়ে গেছি, গুলিয়ে গেছি। দেখছি, সব সেই। তুমি দেখ দেখ অবাক কারখানা।

সলিমান—কি দেখবো ?

চিন্তা—পবন, তপন, স্থল, জল, ব্যোম, গ্রহ,
তারা, চন্দ্র, নেহার, ব্রহ্মাণ্ড সেই সেই
বহুরূপে। ঊর্দ্ধ নিম্নপূর্ণ, পূর্ণ বিভু সনাতন।
লীলাময়ী প্রকৃতি চঞ্চলা অনন্ত,
অনন্ত বিম্ব অনন্ত-সাগরে।
অহং-জ্ঞান-বাষ্পে বিস্ফারিত হয়ে যায়
অবিরত। সলিলম্ব ভোলে, ফিরে যেন
স্বতন্ত্র সকলে—ক্ষণ ভঙ্গ, ক্ষণ রঙ্গ,

এ প্রসঙ্গ—কেবা জানে। উন্মত্ত বিহনে,
মত্ততা কেমনে অন্য জনে অনুমানে
করিবে নির্ণয়। মত্ত রহে মত্ত নিজ
ধ্যানে। নাহি বাক্ তার, নির্ব্বাক্ অবাক্।
সাগরে লবণ মিলি সাগরের জল।"

এই নাটকের সকল চরিত্রের বিস্তৃত আলোচনা এক্ষণে
সুতরাং কেবলমাত্র প্রধান চরিত্রটির সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু
হইল।

এই কালাপাহাড় নাটকে গিরিশচন্দ্র দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, প্রেম, ভক্তি ও ভালবাসার ফলে সংসার যন্ত্রণা হইতে মুক্তিলাভ করা যায়। ঈশ্বর-লাভের সর্ব্বোত্তম পথ প্রেম, ভক্তি ও স্নেহ। জীবের সহিত ঈশ্বরের সম্বন্ধ কি? গুরুর সহিত শিষ্যের কিরূপ সম্বন্ধ হওয়া উচিত, সন্দিগ্ধমনা ব্যক্তির মন কিভাবে সংযত হইতে পারে, নিঃস্বার্থ প্রেম ও স্বার্থপ্রণোদিত প্রেমে কি পার্থক্য—এই সকল তত্ত্বকথা নাট্যকার কয়েকটি ঐতিহাসিক ঘটনার পটভূমিকায় বিশ্লেষণ করিয়াছেন। কালাপাহাড় একটি সন্দিগ্ধমনা পুরুষ চরিত্র। গিরিশচন্দ্রের প্রথম ধর্ম্মজীবনে যে হৃদয়দ্বন্দ্ব সূচিত হইয়াছিল তাহা কালাপাহাড় চরিত্রে পরিস্ফুট। প্রেম এবং ঈর্ষার অপূর্ব্ব সংঘর্ষে এই নাটকের গল্প এবং চরিত্র অতি নিপুণভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে। চঞ্চলা-চরিত্রের ইহাই ভিত্তি। চঞ্চলা প্রেমে কুসুমকোমলা, আবার ঈর্ষাজনিত প্রতিহিংসায় ভীষণা। চঞ্চলা ও ইমানের চরিত্র দুইটি পাশাপাশি অঙ্কিত করিয়া গিরিশচন্দ্র স্বার্থমূলক ও নিঃস্বার্থ প্রেমের সজীব ছবি অঙ্কিত করিয়াছেন। বীরেশ্বর গিরিশচন্দ্রের আর একটি অপূর্ব্ব সৃষ্টি। ভগবানের নিকট কেহ শক্তি কেহ-বা মুক্তি চায় এবং সেই শক্তি-লাভ করিয়াই স্বভাবতঃ তাহার অপব্যবহার করে।

বীরেশ্বর তাহাই করিয়াছিল; পত্নীর (মুরলার) অলৌকিক ভালবাসাই তাহার উদ্ধারের কারণ হয়।

এই নাটকে আর একটি অতি সুন্দর ভাব অঙ্কিত হইয়াছে, তাহা জাতি-নির্ব্বিশেষে ধর্ম্মানুরাগ এবং ঈশ্বরপ্রেম। পরমহংসদেব-কথিত সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়ের ইহা আভাস মাত্র। বস্তুতঃ যে সকল গুণ থাকিলে নাটককে রসোত্তীর্ণ বলা যায়, কালাপাহাড় নাটকে সে সকল গুণের সমাবেশ তো আছেই, অধিকন্তু দার্শনিক তত্ত্বালোচনাপূর্ণ এমন সুসমৃদ্ধ নাটক পৃথিবীর সাহিত্যে বিরল বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না।

বুদ্ধদেব-চরিত

ভগবান্ বিষ্ণু লোককল্যাণের জন্য ধরাধামে অহিংসা ধর্ম্ম প্রচার করিতে অবতাররূপে আবির্ভূত হন। কপিলবাস্তুর শাক্যবংশে রাজা শুদ্ধোদনের গৃহে তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং সিদ্ধার্থ নামে পরিচিত হন। শৈশবে দৈববাণী হইয়াছিল সিদ্ধার্থ রাজচক্রবর্ত্তী হইবেন। জন্মাবধি তিনি সুখের ক্রোড়ে লালিত, সর্ব্বদা লুম্বিনী উদ্যানেই অবস্থান করিতেন। পার্থিব দুঃখ-কষ্টের কোন অভিজ্ঞতা তাঁহার ছিল না। একদিন তিনি নগরভ্রমণে বাহির হইয়া বৃদ্ধ, রুগ্ন, মৃত এই তিন অবস্থার মানুষ দেখিয়া সারথিকে ইহাদের সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়া যখন জানিলেন যে, সকল মানুষই জরা-মরণ-ব্যাধির অধীন, তখন তাঁহার মনে বৈরাগ্যের উদয় হয়। অবশেষে এক ভিক্ষুককে দেখিয়া সারথিকে বলিলেন,—

"দেখ দেখ, গৈরিক বসন প্রশান্ত বদন,
কমণ্ডলু করে, করে ধীরে ধীরে আগমন।
কহ মোরে, এ রহস্য কিবা ?"

সারথি তদুত্তরে বলেন,—

"বাসনা করিয়ে পরিহার, ভ্রমে দ্বার দ্বার
ভিক্ষাজীবী—সংসার সম্বন্ধহীন ;
সুখ আশে দিয়ে জলাঞ্জলি, নির্জনে ঈশ্বরে পূ... ,
ব্রহ্ম উপাসনা বিনা নাহিক কামনা।"

সিদ্ধার্থ আপন মনে ব্রহ্ম সম্বন্ধে নানারূপ জল্পনা করিতে লাগিলেন।

"কোথা ব্রহ্ম ? কোথা তার স্থান ?
শুনি ত্রিভুবন সৃজন তাঁহার ;
তবে কেন রোগ-শোক-জরা
দুঃখের আগার ধরা ?
মৃত্যু কেন এ জীবনের পরিণাম ?
জীবকুল কিবা অপরাধী
নিরবধি সহে দুঃখ ?
সন্তানের দুর্গতি দেখিতে
পিতা কভু নাহি পারে।
এ সংসার সন্তাপ-সাগর,
সহে নর অশেষ যন্ত্রণা ;

কেন ব্রহ্ম না করে মোচন?
রোগ শোকে করে আর্ত্তনাদ—
এ সংবাদ ব্রহ্ম নাহি পায়?
কিংবা ব্রহ্ম
শক্তিহীন দুঃখের মোচনে?
তত্ত্ব আছে অবশ্য ইহার;
শাস্ত্র ব্যাখ্যা সকলই অসার;
শাস্ত্রকার অজ্ঞান সকলে।
সর্ব্বশক্তিমান্ যদি ভগবান্
দয়াবান্ কভু সে ত নয়।"

সিদ্ধার্থ জ্ঞানাহরণ করিয়া দুঃখের কবল হইতে মানবকুলের উদ্ধারের জন্য গৃহত্যাগ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

"সত্বর চালাও রথ
যাব আমি পিতার সদনে;
লইব বিদায়—ভ্রমিব ধরায়
জ্ঞানালোক অন্বেষণে।
দুঃখের উপায় পারি যদি করিতে নির্ণয়,
দেশে দেশে জনে জনে দিব উপদেশ।
কাঁদে প্রাণ এ দুর্গতি হেরি,
আর গৃহে রহিতে না পারি,
মমতায় আর নাহি বদ্ধ রব।
মহাকার্য্য সম্মুখে আমার,—
অলসে না হরিব জীবন।
মহাকার্য্যে যদি মম তনু হয় ক্ষয়,
মৃত্যুকালে প্রবোধিব মনে
যথাসাধ্য করেছি উদ্যম।"

সিদ্ধার্থ গৃহত্যাগের জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন এবং মনে মনে জীবনের ক্ষণ-ভঙ্গুরতার কথা চিন্তা করিতেছেন—

"ক্ষণস্থায়ী দ্বিদল জীবন—
অর্দ্ধ সচেতন—অর্দ্ধ অচেতন।
কেবা জানে কিবা ভাব?

এই রমাদলে কুতূহলে
নাচিল গাহিল,
নানা বেশে—আবেশে অবশ তনু;
হাব ভাব দেখাইল কত;
পুনঃ কি বিকৃত ভাব!—
সংজ্ঞাহীন—নাহিক উৎসব—
শবসম নিপতিত!
কেবা জানে কে পুনঃ উঠিবে?
কিম্বা
মহানিদ্রাঘোরে অচেতন রবে—
কভু না জাগিবে আর!
নহে কিছু বিচিত্র জগতে!
এই শশী—নীলাম্বরে বসি'
ঢালিছে কিরণ-রাশি হাসায়ে মেদিনী;—
কেবা জানে
ঘোর ঘনঘটা কখন উদিবে—
ঢাকিবে কৌমুদী-মালা?
অনিয়ম—বিপরীত খেলা—
মর্ম্ম কেহ নাহি বুঝে!—
এই আছে এই পুনঃ নাই!
হেন বস্তু চাই!
ধিক্ ধিক্ মানবের সংস্কার!
মরুভূমি-মাঝে ভ্রমে—মরীচিকা পাছে পাছে;-
ভুলি' আশার ছলনে,
ওই সুখ, ওই সুখ বলি'
ধেয়ে যায়, উন্মত্তের প্রায়;—
শতবার প্রতারিত—তবু নাহি শিখে;—
শত দুঃখে ভ্রান্তি নাহি ঘুচে!
ধন্য ধন্য সংসার বন্ধন!
যেতে চাই, রাখে যেন ধ'রে!
প্রলোভন কহে মধুস্বরে
কোথা যাও আনন্দ আগার ত্যজি?

বুঝিয়ে না বোঝে মন—
অদ্ভুত বন্ধন।
নিশ্চিন্ত ঘুমায় ;—
দুরন্ত তস্কর কাল
পলে পলে হরে পরমায়ু ;—
তবু নিত্য নূতন কল্পনা—
নিত্য নব সুখ উত্তেজনা।"

সহসা পশ্চাতে সারথি ছন্দককে দেখিয়া সিদ্ধার্থ তাহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিলেন।

"হে সারথি,
বুঝিয়াছি কার্য্য তব নিশাকালে ;
র'য়েছ প্রহরী মম পথ রোধিবারে।
কিন্তু,
জীবন যৌবন তব হরিতেছে কাল—
তত্ব কিছু রাখ তার ?
কর অশ্ব প্রস্তুত সত্বর ;
কারাগারে বদ্ধ নাহি রব আর।"

সারথি প্রস্তুত হইলেন ; সিদ্ধার্থ মাতা-পিতা, মনোরমা পত্নী ও সদ্যোজাত পুত্রের মায়া ছিন্ন করিয়া গৃহত্যাগ করিলেন। কিছু দূর অগ্রসর হইয়া তিনি রথ হইতে অবতরণ করিলেন এবং মহামূল্য রাজপরিচ্ছদাদি খুলিয়া ফেলিয়া সারথিকে প্রত্যাগমনের আদেশ দিলেন। সারথি বিষণ্ন মনে ফিরিয়া আসিল। জ্ঞানাহরণের নিমিত্ত দ্বাদশ বৎসর কঠোর সাধনার পর ভিক্ষুবেশে সিদ্ধার্থ নানা স্থান পর্য্যটন করিতে লাগিলেন। এই সময় মগধের রাজা বিম্বিসার পুত্র-কামনায় দেবীপূজার অনুষ্ঠান করিয়া লক্ষ ছাগবলির আয়োজন করিয়াছেন—শুনিয়া তিনি সে স্থানে উপনীত হইলেন। ব্যথিতহৃদয় সিদ্ধার্থ অনেক যুক্তিতর্কের দ্বারা রাজাকে এই নিদারুণ কর্ম্মের অনুষ্ঠান হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিলেন। "হিংসায় কভু কি হয় ধর্ম্ম উপার্জন ? দেব তুষ্ট হিংসায় কি হয় ? হিংসার অধিক পাপ নাহিক জগতে" ইত্যাদি।

ইহাতে রাজার মতির কোনরূপ পরিবর্ত্তন হইল না বুঝিয়া অবশেষে সিদ্ধার্থ আত্মবলি দিতে প্রস্তুত হইলেন এবং বলিলেন—

"কিন্তু যদি বলিদান বিনা
তুষ্টা নাহি হন ভগবতী
দেহ মোরে বলিদান;
দ্বাদশ বৎসর করেছি কঠোর তপ
যদি তাহে হ'য়ে থাকে ধর্ম্ম উপার্জন,
করি রাজা তোমারে অর্পণ, সুপুত্র হউক তব;
যদি তব থাকে কোন পাপ,
পুত্র বিনা যার হেতু পেতেছ সন্তাপ,
ইচ্ছায় সে পাপ আমি করিব গ্রহণ,
বধ, রাজা, আমার জীবন—
নিরাশ্রয় ছাগগণে দেহ প্রাণদান।
নরনাথ! কল্যাণ হইবে,
পুত্র কোলে পাবে
এড়াইবে জীবহিংসা দায়।
আপন ইচ্ছায়,
তব কার্য্যে অর্পি নিজ কায়;
তাহে তব নাহি পাপ।
রাখ রাখ যোগীর মিনতি—
বসুমতী কলুষিত ক'র না, ভূপাল।
স্বার্থ হেতু—
ক'র না হে কোটি প্রাণী বধ।
কোথায় ঘাতক! রাজকার্য্যে বধ মোরে।"

সিদ্ধার্থের এই কথায় বিম্বিসারের হৃদয় গলিয়া গেল। বিম্বিসার নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিলেন এবং সংসার ত্যাগ করিয়া সিদ্ধার্থের সহিত যাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। সিদ্ধার্থ তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন রাজ্যধন ত্যাগে কোন ফল নাই; অহিংসভাবে প্রজাপালন করিবার পরামর্শ দিয়া তিনি বিদায় লইলেন এবং যাওয়ার সময় রাজাকে বলিয়া গেলেন—

"হয় যদি সফল জনম—
পাই যদি দুর্লভ রতন

কহি সত্যবাণী, নৃপমণি,
দিব আনি সে রত্ন তোমারে।"

অন্যত্র গিয়া সিদ্ধার্থ পুনরায় ধ্যানে মগ্ন হইলেন। মার, সন্দেহ, কুসংস্কার, কাম প্রভৃতি বিঘ্নসৃষ্টিকারীরা সিদ্ধার্থকে বিচলিত করিতে প্রয়াসী হইল। কিন্তু তাহারা সফল হইল না। তিনি যোগবলে সকল রিপু জয় করিয়াছিলেন। অবশেষে একদিন তপস্যা করিতে করিতে তিনি বোধিসত্ব লাভ করিলেন। গিরিশচন্দ্র তখনকার অবস্থার যে বর্ণনা দিয়াছেন, তাহার মধ্য দিয়া কবির দার্শনিক জ্ঞান ও সুগভীর মননশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। শুধু তাহাই নহে, জন সাধারণের মনোরঞ্জনের জন্য কাব্য বা নাটকে জটিল দার্শনিক তত্ত্বের অবতারণা করা এক দিকে যেমন দুঃসাহসের পরিচয় অপর দিকে তেমনি অসাধারণ সৃজনী প্রতিভা না থাকিলে সাফল্যলাভও সুদূরপরাহত। নাটকের মধ্য দিয়া তত্ত্বালোচনায় গিরিশচন্দ্রের যে বিশেষ ক্ষমতা ছিল তাহা অনস্বীকার্য্য। তখনকার অবস্থা বর্ণনাপ্রসঙ্গে সিদ্ধার্থ বলিতেছেন—

"কি দেখি! কি দেখি!—জলবিম্বপ্রায়
কত শত বিশ্ব ভাসে অসীম অনন্ত স্থানে,—
উজ্জ্বল—উজ্জ্বলতর ক্রমে!—
কে করে গণন,
ঘূর্ণ্যমান কত শত বিশাল ভুবন
রক্ষার কারণ,
কিরণ-শরীর ফেরে দেবদূতগণ?
ভিন্ন লোক—
কিন্তু এক নিয়ম অধীন!
বিচিত্র নিয়ম!—
ফোটে আলো—আঁধার হইতে;—
অচেতন—সচেতন—ক্রমে;
স্থূল শূন্যেতে মিশায়;—
শূন্য পুনঃ স্থূল প্রসবিনী;
মৃত সঞ্জীবিত;—
জীবন মরণ করে গ্রাস;—
মহাশক্তি ভাঙ্গে গড়ে?
নিয়ত এ শক্তি বহে—হ্রাসবৃদ্ধিহীন।

এস, সত্য, হৃদয়ে আমার—
কর মোরে অধিকার।
যাও যাও নশ্বর নয়ন
ক্ষুদ্র দৃষ্টি তব প্রয়োজন নাহি আর।”

সিদ্ধার্থ যোগবলে শূন্যে উঠিলেন।

“এই সত্য!
দুঃখ ছায়াসম জীবনের সাথী;
অত্যাজ্য জীবনে—
না হবে বারণ, প্রাণ রবে যতক্ষণ;
জনম—বর্দ্ধন—মৃত্যু—অবস্থা কেবল;—
দ্বেষ বা প্রণয়—
আনন্দ—যন্ত্রণা—মানসিক অবস্থার ভেদ;
যত দিন না ফোটে নয়ন—
মায়া বোধ যত দিন না হয় এ সব—
তদবধি নাহি যায় দুঃখ-সুখভোগ;
অবিদ্যাজনিত ছল যেই জন জানে—
টুটে তার জীবন-মমতা;—
মায়ার ছলনে হয় সংস্কার উদয়;—
পঞ্চভূত হ’য়ে সম্মিলন
জীবজ্ঞান করিছে সৃজন;—
জীবজ্ঞানে তৃষ্ণার উদ্ভব—
বেদনা সন্তান তার।
সে তৃষ্ণায় যত কর পান,
না হয় নির্ব্বাণ—
বৃদ্ধি হয়, অগ্নি যথা আহুতি প্রদানে;
আমোদ প্রয়াস—উচ্চ আশ—
ধনলিপ্সা যশোলিপ্সা আদি—
তৃষ্ণানলে ঘৃতাহুতি;—
সযতনে জ্ঞানার্জ্জনে তৃষ্ণা করে দূর,—
কর্ম্মফলে দুঃখ সুখ ভোগ—
কর্ম্মগত ভোগ সহে ধৈর্য্যে বাঁধি প্রাণ,

নিগ্রহে ইন্দ্রিয় হয় হত,
ক্রমে তায় হয় কর্ম্মনাশ ;
কর্ম্মধ্বংসে পবিত্রতা করে অধিকার—
নির্ব্বিকার, উপাধিবিহীন,—
স্বপ্নবৎ অবিদ্যা ফুরায় ;
দেবের দুর্লভ অতুল বৈভব
জরা মৃত্যুহীন
নির্ব্বাণ-রতন করে লাভ।
জেনেছি—জেনেছি—
পূর্ব্বতন বোধিসত্ত্ব বংশোদ্ভব আমি—
নাহি মম নাম—নাহি জন্মভমি—
গোত্র—জাতি—বর্ণ বা জীবন!
জ্ঞানালোক—জ্ঞানালোক—
তিমির নাহিক আর।"

তত্ত্বজ্ঞানলাভের পর সিদ্ধার্থ নানা স্থানে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন। নানা স্থানে সংঘ বা মঠ গড়িয়া উঠিল। দলে দলে লোক বৌদ্ধ-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে লাগিলেন। ধর্ম্মপ্রচার মানসে কপিলাবাস্তু নগরে বুদ্ধ উপনীত। বেণুবনে এক অদ্ভুত সন্ন্যাসীর আবির্ভাবে মন্ত্রীর মনে সন্দেহ জাগিয়াছে—হয়ত বা এই সেই সিদ্ধার্থ। রাজা ও রাণীকে লইয়া মন্ত্রী সেই বনে সমাগত। দূরে সন্ন্যাসীকে দেখিয়া রাজা-রাণী আত্মহারা। মন্ত্রী রাজাকে ধৈর্য্য অবলম্বন করিতে বলিলেন এবং সন্ন্যাসীর নিকট গিয়া তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন—

"কে তুমি সন্ন্যাসিবেশে ভ্রম রাজপথে
কহ, কেবা তুমি—কোন্ বংশজাত?
নৃপতি যাচেন পরিচয়।
সিদ্ধার্থ—ভিক্ষাজীবী, বাস মম যথায় তথায়।"

রাজা শুদ্ধোদনের দৃঢ় প্রত্যয় হইয়াছে—সন্ন্যাসী তাঁহারই পুত্র—

"কহ, হে সন্ন্যাসি,
কোন্ বিধিমতে ত্যজি কুলাচার,
রাজপুত্র ভ্রমিতেছ ভিক্ষুকের বেশে?"

সিদ্ধার্থ স্বীয় পরিচয় জানাইলেন যে, তিনি রাজপুত্র নহেন, বোধিবংশে তাঁহার জন্ম ; কুলব্রত অনুসারে ভিক্ষাপাত্রহস্তে তিনি দেশে দেশে ভ্রমণ করিতেছেন কিন্তু রাজা শুদ্ধোদন এই কথায় আস্থা স্থাপন করিতে পারিলেন না সিদ্ধার্থ তখন নিজের সম্যক্ পরিচয় দিলেন—

"শুন নৃপমণি, নহে মিথ্যাবাণী ;
মায়া জন্ম রাজবংশে মম—
মায়া জন্মে তুমি পিতা—
মায়া জন্মে রাজার কুমার,
ছিল পুত্র পরিবার—
জ্ঞান সূর্য্যোদয়ে ভাঙ্গিয়াছে ঘুম-ঘোর ;
স্বপ্ন নাহি আর—
চৈতন্য নেহারি'। বোধি-বংশোদ্ভব আমি
নিত্য আমি—
নাহি জন্ম—নাহিক মরণ—
নাহি নাম ধাম—উপাধি রহিত
সাধিবারে মানবের হিত,
ভ্রমি দ্বারে দ্বারে ;
যেবা চায় জ্ঞানালোক দিব তারে—
এই মহাকার্য্য মম ভবে।"

অতঃপর শুদ্ধোদন, রাণী গোতমী ও মন্ত্রীকে নবধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া বুদ্ধ রাজান্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। বিরহিণী গোপা তমালতলে বসিয়া অতীত দিনের কত কথা মনে মনে আলোচনা করিতেছেন, আর প্রাণকান্তকে একটিবার দেখিবার জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতেছেন ; এমন সময় বুদ্ধ সেই স্থানে প্রবেশ করিলেন ; দর্শনমাত্রই গোপা তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া পদতলে লুটাইয়া পড়িলেন। মিষ্ট সম্ভাষণে গোপাকে ধীরে ধীরে উঠাইয়া বুদ্ধ তাঁহাকে এবং পুত্র রাহুলকে দীক্ষিত করিলেন। এইরূপে জরা-মরণ-ব্যাধির দুঃখ হইতে জীবকুলের পরিত্রাণের পথ নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন।

ভগবান্ বুদ্ধ স্বয়ং বিষ্ণুর অবতার। নাটকের প্রারম্ভে দয়া বিষ্ণুকে প্রশ্ন করিয়াছিল—

"কটাক্ষে তোমার—সৃজন পালন লয়,
তবে কেন বার বার ধর নরদেহ ?

গর্ভবাস কি হেতু বা সহ?
প্রয়োজন ইচ্ছায় সাধিতে পার।"

বিষ্ণু তাহার উত্তরে বলিয়াছিলেন—

"সুলোচনে, শুন বিবরণ—
একা আমি, নাহি অন্য জন;
ব্যোম, সমীরণ, তপন, সলিল, স্থল,
আমিই সকল,—
মায়াবলে নানারূপে করি কেলি।
আমি জ্ঞান, আমিই অজ্ঞান;
আমি মন-প্রাণ, আমি দয়া,
আমি নিষ্ঠুরতা,
আমি ভক্ত, আমিই ঈশ্বর,
বাসনায় হের চরাচর।
অদ্বিতীয় একব্রহ্ম আমি,
বহুজ্ঞান মায়ার সংযোগে!
দূর কর ভ্রম—
হের, সতি, বিরাট মূরতি মম!"

Sir Edwin Arnold-এর Light of Asia নামক গ্রন্থের উপর ভিত্তি করিয়া যদিও 'বুদ্ধদেব-চরিত' রচিত, তথাপি নাটক হিসাবে ইহা একেবারে মৌলিক বলা যায়। একথা অনস্বীকার্য্য যে, ইহার মধ্যে ইংরাজীর ভাব বা সৌন্দর্য্যের কোন ছাপ নাই। নাটকীয় পরিবেশসৃষ্টি, ভাষা ও ভাবের প্রাঞ্জলতায় দর্শকমনের উপর ইহা যেরূপ প্রভাব সৃষ্টি করিতে পারিয়াছিল, খুব কম নাটকই সেইরূপ প্রভাব বিস্তার করিতে পারিয়াছে।

বিল্বমঙ্গল ঠাকুর

"কে চিনিবে ভাল-মন্দ, ভাল-মন্দে ভরা ধরা।
ভাল হ'তে মন্দ ঘটে, মন্দ কভু ভালয় ভরা।
হের প্রেম-রত্ন আশে
প্রেমিক ধায় মন্দ-বাসে,
বারনারী যথা হাসে ছড়ায়ে গরল ধারা।

সর্পসম ব্যবহার
চমক ভাঙ্গিল তার,
ত্যজিয়ে সে মোহাগার ফিরে প্রেমে মাতোয়ারা

চৈতন্যরূপিণী আসি
ঢালে জ্ঞানামৃত রাশি,
হ'ল শুদ্ধ তনু-মন ছিল যা বিকার ভরা।

রূপ-মোহ নাহি আর
বণিকেরা সাক্ষী তার,
বিদ্ধ করি আঁখিদ্বার চলে পাগলের পারা।

রাখাল বালকবেশে
হের সে চতুর আসে
ল'তে বৃন্দাবন-বাসে মহা সাধু প্রেমে ভরা।"

লেখকের রচিত বিল্বমঙ্গলের প্রস্তাবনা।

'ভক্তমাল' নামক সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণবগ্রন্থ হইতে বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের জীবনাখ্যায়িকার কাঠামোটি মাত্র গৃহীত। কবি গিরিশচন্দ্র জ্ঞান, ভক্তি ও বিশ্বাসপূর্ণ সরস লেখনীর সাহায্যে উহার উপর দেবীপ্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

বিলাসী বিল্বমঙ্গল

বিল্বমঙ্গল ছিলেন সেকালের একজন ধনাঢ্য যুবক বুদ্ধিমান্, ভক্তিমান্ ও প্রেমিক। কিন্তু অবিদ্যাবশতঃ তাঁহার অন্তরের প্রেম ন্যস্ত হইয়াছিল অপাত্রে। ঘৃণা, লজ্জা, ভয় সবকিছু বিসর্জন দিয়া চিন্তামণি নাম্নী জনৈকা বারাঙ্গনার প্রতি তিনি আসক্ত হন। এই আসক্তি এত তীব্র যে, পিতৃশ্রাদ্ধদিনে নদী পার হওয়া নিষিদ্ধ সত্ত্বেও রাত্রিকালে কাষ্ঠভ্রমে ভাসমান গলিত শবের সাহায্যে নদী পার হইয়া এবং রজ্জুভ্রমে বিষধর সর্পের লেজ আকর্ষণ-পূর্ব্বক প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া তিনি চিন্তামণির বাড়ীতে প্রবেশ করেন।

বিলাসিতার চরম পরিণতি

সামান্য একটি দিয়াশলাইয়ের কাঠি জ্বলিয়া উঠিলে যেমন শতাব্দীর পুঞ্জীভূত অন্ধকার মুহূর্ত্তে আলোকিত হইয়া উঠে, তেমনি চিন্তামণির উপদেশমিশ্রিত একটি মৃদু ভৎসনায়,—"এই মন, আমি বেশ্যা, যদি আমায় না দিয়ে হরিপাদপদ্মে দিতে তোমার কাজ হ'ত।" মুহূর্ত্তের মধ্যে তাঁহার মোহ দূর হইয়া গেল। বিল্বমঙ্গল জীবনের নশ্বরতা বুঝিতে পারিলেন। আত্মার আত্মীয়ের জন্য তাঁহার মন তখন বড়ই উতলা—

বৈরাগ্যের উন্মেষ এবং বারাঙ্গনার ভর্ৎসনায় চক্ষুরুন্মীলন ও বৈরাগ্য উদয়.

"হেরি আজ নিবিড় আঁধার ;—
আমি কার কে আছে আমার ?
কার তরে জীবনের উত্তাপ বহন ?
শূন্য অভিপ্রায়ে,
ঘুরিতেছি নশ্বর,—নশ্বর ছায়া মাঝে
কোথা, কে আছ আমাব ?
দেখা দাও, যদি থাক কেহ—
জুড়াই প্রাণের জ্বালা,
প্রাণ মন করি সমর্পণ।

কোথা যাব ? কোথা দেখা পাব ?
অন্ধকার মাঝে হ'য়ে আছি দিশাহারা—
কে দেখাবে আলো ?
খুঁজে লব আমার যে জন।"

বিল্বমঙ্গলের এই অনুসন্ধিৎসু মন ও সংশয়াত্মিকা বুদ্ধি সমাহিত হইল গিরিশচন্দ্রের অপূর্ব্ব সৃষ্টি জনৈকা পাগলিনীর গীতে ;—

সত্যতত্ত্ব অন্বেষণে যাত্রা

"আমি জানতে এলেম তাই,
কে বলেরে আপনার রতন নাই,
সত্যি মিছে দেখ্না কাছে,
ক'চেছ কথা সোহাগ ভরে।"

বিল্বমঙ্গল সংসার ছাড়িয়া, চিন্তামণির আসক্তি ছাড়িয়া বিবাগী হইয়া গেলেন। পথে সোমগিরির সহিত দেখা। সোমগিরি তাঁহাকে কৃষ্ণ আরাধনায় উৎসাহিত করেন। বিল্বমঙ্গল রাধা-কৃষ্ণের দর্শনলাভ কিরূপে সম্ভব জিজ্ঞাসা করিলে সোমগিরি তাঁহাকে বলেন—"কৃষ্ণকে ডাকুন, তিনিই বলে দেবেন, কোথায় তাঁর দেখা পাবেন।" বিল্বমঙ্গল আশান্বিত হইলেন।

সোমগিরির সহিত মিলনে গুরুকরণ, ভক্তিপথে দীক্ষা-লাভ ও কৃষ্ণানুসন্ধানে যাত্রা

বাপীতটে সোমগিরির শিষ্য গুরুকে জিজ্ঞাসা করিল—"যে মহাপুরুষ দর্শনে আপনি এসেছিলেন তিনি কোথায় ?

সোমগিরি—আমার সে মহাপুরুষ দর্শনলাভ হয়েছে, তুমি কি দেখনি ?

শিষ্য—কই প্রভু, কই—দেখিনি তো।

সোম—কেন, বিল্বমঙ্গলকে দেখনি ?

শিষ্য— * * আপনি একজন লম্পট্‌কে দেখতে এসেছেন ? ওর বেশ্যার দায়ে বৈরাগ্য হ'য়েচে, কত দূর স্থায়ী হয়, বলা যায় না।

সোম—কামিনী কাঞ্চন—

এক মায়া, দুই রূপে করে আকর্ষণ,
বিষম বন্ধনে রহে জীব মুগ্ধ হ'য়ে।
ভ্রমি এ সংসারে, হের দ্বারে দ্বারে,
কেবা চায় নিরঞ্জনে, কামিনী কাঞ্চন ত্যজি।
সেই মহাজন,
এ বন্ধন যে করে ছেদন ;
অবহেলি কামিনী কাঞ্চন,
নিরঞ্জন করে আশা।
স্বার্থশূন্য প্রেমলুব্ধ মন,
প্রেমের কারণ
করেছিল বেশ্যা উপাসনা,
বিফল কামনা।
ক্ষুদ্রাধারে প্রেম কোথা পাবে স্থান ?
প্রেমে মত্ত প্রেমিক পুরুষ,
প্রেমময় আশে
সংসার দলেছে পায়

সোমগিরি কর্তৃক বিল্বমঙ্গলের প্রকৃত পরিচয় ও মহত্বপ্রকাশ

অতি তীব্র বৈরাগ্য সঞ্চার
উন্মত্ত আকার,
এক মনে ডাকে ভগবানে।"

বাপীতটে কৃষ্ণ আরাধনায় নিমগ্ন প্রেমোন্মত্ত বিল্বমঙ্গল ; কিন্তু কিছুতেই তাঁহার চিত্ত স্থির হইতেছে না। অকস্মাৎ বণিক্‌পত্নী অহল্যার প্রতি তাঁহার দৃষ্টি পতিত হইল এবং মনে তৎক্ষণাৎ রূপজ মোহ জাগিয়া উঠিল—

"বিল্বমঙ্গল— আরে রে নয়ন,
মন্মথের তুইরে প্রধান সেনাপতি,
ছদ্মবেশে আপন হইয়ে,
শত্রু ডেকে আন ঘরে।
সুখ-আশে সতত বিকল,
মূঢ় মন নাহি বুঝে ছল,
সাপিনীরে হৃদে দেয় স্থান—
ঈশ্বরের স্থান যথা।
সে করে দংশন,
তবু আঁখি আনে প্রলোভন ;
জ্বালায় ব্যাকুল—
পোড়া প্রাণ পুনঃ তারে দেয় কোল।
শত লাঞ্ছনায় ধিক্কার না হয়
তবু ছলে আঁখি, বলে—
জুড়াবার এই ধন।
ধন্য সংস্কার!
মন, পশু তুমি—
তোমারে কি দিব দোষ?
চল মন যথা আঁখি নিয়ে যা।"

বণিকের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিয়া বিল্বমঙ্গল একরাত্রের জন্য বণিক্‌পত্নীর সঙ্গ কামনা করিলেন। অতিথির প্রার্থনা পূর্ণ হইল। বণিক্‌পত্নী রূপসী অহল্যা সম্মুখে দণ্ডায়মানা। তাহাকে নিরীক্ষণ করিয়া বিল্বমঙ্গলের রূপজ

মোহ কাটিয়া গেল। তাঁহার বিবেক জাগ্রত হইল। বিল্বমঙ্গল নিজের মনকে বুঝাইতে লাগিলেন,—

"(স্বগত) ভেবে দেখ মন,
কত তোরে নাচায় নয়ন!
ছিলি ব্রাহ্মণকুমার—
বেশ্যা-দাস নয়নের অনুরোধে।
পিতৃশ্রাদ্ধ দিনে, ধৈর্য্য নাহি প্রাণে—
ঘোর নিশা মহাঝঞ্ঝাবাতে,
তরঙ্গের সনে রণ,
রহিল জীবন শবদেহ-আলিঙ্গনে!
সর্পে রজ্জু ভ্রম,
হেন অন্ধ করেছে নয়ন!
পুরস্কার—বারাঙ্গনা-তিরস্কার!
মন, হাসি পায়,
হ'ল তোর বৈরাগ্য উদয়;
চ'লে গেলি একবাসে গৃহবাস ত্যজি,
'কোথা কৃষ্ণ?' বলি' হ'লি উতরোলি
যেন তোর কত প্রেম!
আরে রে পাগল মন,
ধ্যানে মগ্ন বাপীতটে সাধুর আকার,
শুনি কঙ্কণ ঝঙ্কার,
চাহিলি নয়ন মেলি!
দেখ্ পুনঃ নয়নের ছলে
কি উন্মাদ দশা তোর!
মন, তুমি আঁখির গরব কর?
নিত্য ডর,—পাছে যায় এ রতন?
দেখ্ তোর আঁখির আচার।
সেই মাংস অস্থি,
কাষ্ঠভ্রমে প্রাণের তাড়নে
দিলে যারে আলিঙ্গন,
সেই মত গলিত হইবে,

বাহ্যিক এ লাবণ্যের আবরণ—
এই রত্ন ভাব তুমি সংসারের সার ?
ভাব, মন, বৃথা জন্ম তার
এ রতনে বঞ্চিত যে জন ?
বুঝ, মন, নয়ন তোমা।
অন্ধ কিবা নহে ?
কিছু নাহি হেরে,
অসার যে বস্তু, তাহে কহে নিত্যধন।
এর ছলে কতদিন রবি ভুলে ?"

সেই রাত্রে বিল্বমঙ্গল স্বহস্তে চক্ষু বিদ্ধ করিয়া বাহ্য রূপের আকর্ষণ হইতে চিরদিনের মত মুক্ত হইলেন।

"মন, এখন' কি আঁখির মমতা কর ?
শত্রু তোর শীঘ্র কর বধ।
দিব আমি উত্তম নয়ন ;
যেই আঁখি ব্রজের গোপালে
'আমার' বলিয়ে তুলে নেবে কোলে,
অন্য সব দেখিবে অসার,
যাও—যাও—নশ্বর নয়ন।"

ইহার পর হইতে তিনি অনন্যচিত্ত হইয়া প্রেমময় কৃষ্ণের আরাধনা করিতে থাকেন। ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু শ্রীকৃষ্ণ রাখাল বালকের রূপ ধরিয়া আসিয়া তাঁহাকে বৃন্দাবনে যাইতে সাহায্য করেন। এইরূপে তাঁহার ইষ্টলাভ হয় এবং দিব্যদৃষ্টির সাহায্যে তিনি কৃষ্ণের দর্শন পান। এই রাখাল বালক গিরিশচন্দ্রের এক অভিনব সৃষ্টি।

বিল্বমঙ্গল নাটকের পরিচয়প্রসঙ্গ আমরা এখানেই শেষ করিলাম। বিল্বমঙ্গল নাটক সম্বন্ধে বাগ্মিবর স্বর্গীয় বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় বলিয়াছিলেন—"গিরিশ-চন্দ্র নিজে বিল্বমঙ্গল ছিলেন, তাই তিনি এইরূপ দেদীপ্যমানভাবে নাটকে বিল্বমঙ্গলের মহনীয় চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন।" তিনি আরও বলিয়াছিলেন—"গিরিশচন্দ্র আমাদের মত সাধারণ মানুষের ন্যায় সংসারের ধূলাকাদা গায়ে মাখিয়াছিলেন। কিন্তু সেই ধূলাকাদামাখা দুই পাখাবিশিষ্ট গিরিশরূপী পাখী আকাশে উঠিয়া যখন পক্ষদ্বয় ঝাড়িতে থাকেন তখন এ সংসারে সুবর্ণবৃষ্টি হইয়াছিল।"

চৈতন্যলীলা

দেশে ধর্ম্মবিপ্লব, পাপাচার, অনাচার এবং বহু অনর্থ পাত না হইলে শ্রীভগবান্ বা তাঁহার কোন বিশেষ শক্তি ধরায় মূর্ত্তি পরিগ্রহ করেন না। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ পাদে বাংলার তথা ভারতের অবস্থা যে অতীব শোচনীয় হইয়াছিল তাহার প্রভূত নিদর্শন পাওয়া যায়। মানুষের মন হইতে ভক্তি বিশ্বাস প্রায় অপনোদিত হইতে চলিয়াছিল। প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের ইহাই হেতু। চৈতন্য-লীলা নাটকের ১ম ও ২য় গর্ভাঙ্কে শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের হেতুটি সুকৌশলে নাটকোচিত পরিবেশের মধ্য দিয়া ব্যক্ত হইয়াছে। ষড়রিপুর তাড়নায় মানুষ সর্ব্বদা পাপাচারে নিমগ্ন। যাঁহারা জ্ঞানী বলিয়া অভিহিত তাঁহারাও আত্মাভিমানী, মাৎসর্য্যপরায়ণ ও অহঙ্কারী। যাঁহারা সংসারবিবাগী সন্ন্যাসী তাঁহারাও লোভ ও কামনার দাস। অতএব মানুষের মুক্তির উপায় কি? কেবল জ্ঞান বা কেবল বৈরাগ্য মানুষকে মুক্তির পথে টানিয়া আনিতে অক্ষম। সুতরাং ভক্তিই একমাত্র মুক্তির উপায়। 'ভক্তিস্রোতে মুক্তি ভেসে যায়। ভক্তজনে রিপু কি অধিকার? রিপু দাস তার।' মানুষকে এই ভক্তিমার্গে টানিয়া আনিবার জন্যই প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্য আবির্ভূত হইয়াছিলেন। শুভক্ষণে গিরিশচন্দ্র এই নাটক লিখিয়া পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাভিমানী নব্য বঙ্গ ও মুণ্ডিতমস্তক তিলকধারী বৈষ্ণবকে একাসনে বসাইয়া কাঁদাইয়াছিলেন। নাট্যমন্দিরকে এই সময় বঙ্গবাসী ধর্ম্মমন্দিরের চক্ষে দেখিয়া যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করেন। চৈতন্যলীলার অভিনয়দর্শনে সমস্ত বঙ্গদেশ হরিনামে মাতিয়া উঠিয়াছিল। শ্রীভগবান্ মানুষীতনু আশ্রয় করিয়া যুগে যুগে যুগ-প্রয়োজনে অবতীর্ণ হন। নরদেহ ধারণ করিলে স্বভাবতঃ মানুষের স্বরূপ তন্মধ্যে প্রকট হয়। আবার মহাভাবাবেশে সময় সময় তাহার মধ্যে ভগবৎ সত্তা ফুটিয়া উঠে। সে সময়ের সমস্ত কার্য্য বা বাণী ঈশ্বরের কার্য্য বা বাণীর অনুরূপ। গিরিশচন্দ্র নিমাইকে অনেক সময় সেইভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন। মাতা শচীর সহিত কথোপকথনে ভাবাবেশে নিমাই বলিতেছেন—

"শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী,
ভ্রান্ত জীব নেহার মুরারি,
হের করজোড়ে ব্রহ্মা আদি করে স্তব।
যুগে যুগে হই অবতার—দানব সংহার হেতু।
সৃষ্টি-স্থিতি-লয় আমাতেই হয়,
পূর্ণ আমি সর্ব্বঘটে বিদ্যমান।

শচী—নিমাই, নিমাই, বাবা—একি ?

নিমাই—দেখ, দেখ, খোলহ নয়ন,
লোমকূপে ব্রহ্মাণ্ড করহ দরশন,
কেবা পিতামাতা, কেবা পুত্র-ভ্রাতা,
বহুরূপে আমিই সংসারে।

শচী—সর্ব্বনাশ, কি হ'ল—আমার,
নিমাই। নিমাই। স্থির হও বাপধন।

নিমাই—কেবা তুমি ? কে তব নিমাই ?
একা আমি অন্য আর নাই,
বহুরূপা প্রকৃতি নর্ত্তকী।

শচী—ওমা, ওমা, কি হলো আমার।
ডাকিনী কি পশিল নিমায়ে ?
কিম্বা বায়ুরোগ হলো,
একি ঘোর বিড়ম্বনা।

নিমাই—অনন্ত শয্যায় মগ্ন একার্ণব মাঝে,
যোগমায়া-বলে পদসেবা ছলে
ব'সে লক্ষ্মী পদতলে ;
কে করে নির্ণয় সৃষ্টি-স্থিতি-লয়,
কোটি কোটি হইতেছে মুহূর্ত্তেকে,
মায়ায় সৃজন, মায়ায় পালন,
মায়ায় নিধন পুনঃ।
এক মায়া বহু আবরণে ;
যুগ, বর্ষ, পল মায়ায় সকল
মায়াবলে স্থান নিরূপণ,
ভ্রান্তিরূপা মায়ায় প্রভেদজ্ঞান।
বাসনায় জগৎ-সৃজন,
কর জীব বাসনা-বর্জন,
নিত্যধন পাবে অনায়াসে,
বাসনায় মনের জনম,
মন সৃষ্টি করে এ শরীর
অনন্ত বাসনা উঠে তার ;

ভাসে মন বাসনা-সাগরে ;
মোহ অন্ধকারে আপনা পাসরে
শিব ভুলি হয় জীব ;
আমি আমি—জন্মে মহাভ্রম,
সুখ-আশে দুখে নিমগন,
গতাগতি দুর্গতি অপার,
অহঙ্কার তবু নাহি যায়,
জন্মমৃত্যু সহে অনিবার
নিস্তারের না ভাবে উপায়।
জীবে কৃপা করি, আসিয়াছি নরদেহ ধরি,
হরি নামে হরিব জীবের মোহ ;
তাপিত যে জন—লহ রে শরণ—
বন্ধন ঘুচিবে তোর।”

নাটকের অনেক স্থানে এইরূপ ভাবাবেশে নিমাই আপন স্বরূপ প্রকাশ করিয়াছেন। আবার অন্যত্র মানুষ হিসাবে জগৎগুরু বা শিক্ষাদাতা হিসাবে তিনি মানুষকে উপদেশ দিয়াছেন—হরিনামে মাতাইয়া তুলিয়াছেন। নিমাই সংসারত্যাগের সঙ্কল্প করিয়াছেন। জননী কাঁদিয়া আকুল। নিমাই সান্ত্বনা দিয়া বলিতেছেন—

“ ‘কৃষ্ণ’ ব’ল কাঁদ মা জননি,
কেঁদ না ‘নিমাই’ ব’লে,
‘কৃষ্ণ’ ব’লে কাঁদিলে সকলি পাবে,
কাঁদিলে ‘নিমাই’ ব’লে নিমাই হারাবে,
কৃষ্ণ নাহি পাবে,

*　　　*　　　*

ধন্য তুমি জননী আমার,
পুত্র তব হরিনাম বিলাইবে,
ভবে কেবা, ক’বে হেন গৌরবিণী।
পিতৃদেবগণ—
আছিলেন বিষ্ণুপরায়ণ সবে,
সেই পুণ্যে বিষ্ণুর সেবক তব সুত ;

বিষ্ণুর প্রসাদে নাম করিব প্রচার
হরিনামে নাচিবে সংসার ;
হেন কার্য্যভার পুত্রেরে কি দিতে নার ?
*　　*　　*
ধ'রে মানব-জীবন,
পশু হ'য়ে কেন রব ?
ব্রহ্মার দুর্লভ ভবের বৈভব
শ্রীপদ-পল্লব এনে আমি দিব তোরে,
মায়া-বশে নাহি কর নিবারণ।"

বিশ্বাসের উচ্চতর সোপানে আরোহণ না করিলে, কোন কবির পক্ষে এরূপ সহজ স্বচ্ছ ভাষায় এমন উচ্চ স্তরের ভাব ব্যক্ত করা কি সম্ভব ? এই কয়টি পংক্তির মধ্যে গিরিশচন্দ্র ভগবদ্বিশ্বাসের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। সারা বাংলাদেশ ভক্তিস্রোতে প্লাবিত হইল। পথে ঘাটে সর্ব্বত্রই হরিগুণগান।

নাট্যাচার্য্য অমৃতলাল বসু চৈতন্যলীলার অভিনয় সম্বন্ধে মন্তব্যপ্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—

"বখাটে নট ও অখাঁটি নটীবৃন্দ দ্বারা দেশে ধর্ম্ম প্রচার হইল। ছিঃ ছিঃ! এ-কথা মনে আসিলেও স্বীকার করিতে নাই, তাতে পাপ আছে। মনে হয় যেন এই নগণ্য সম্প্রদায়কে 'জঘন্য' বেদীতে শ্রীকৃষ্ণমহিমা কীর্ত্তন করিতে শুনিয়াই ধর্ম্মবিপ্লবকারী বীরগণ অন্তরে ঈষৎ কম্পিত হইলেন, আর ধর্ম্মপ্রাণ নিদ্রিত হিন্দু জাগরিত হইয়া ব্রজরাজ ও নবদ্বীপচন্দ্রের বিশ্বমোহন প্রেম প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন। নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, পল্লীতে পল্লীতে সংকীর্ত্তন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইল। গীতা ও চৈতন্য-চরিতের বিবিধ সংস্করণে দেশ ছাইয়া পড়িল। বিলাত প্রত্যাগত বাঙালী সন্তানও লজ্জিত না হইয়া সগর্ব্বে আপনাকে হিন্দু হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিতে আরম্ভ করিল।"

শ্রীশ্রীঠাকুর রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব চৈতন্যলীলার অভিনয় দেখিতে আসিয়াই সর্ব্বপ্রথম রঙ্গালয়ে পদার্পণ করেন। জনৈক ভক্তের 'কেমন দেখলেন' এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন 'আসল নকল এক দেখলাম।'

Colonel H. S. Olcott চৈতন্যলীলার অভিনয় দেখিয়া উহার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন এবং মন্তব্যপ্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—

"As for the Chaitanya Lila I unhesitatingly affirm that it is impossible for anyone *　*　*

to witness the play without a rush of spiritual feeling and religious fervour."

নবদ্বীপের বিখ্যাত পণ্ডিত ব্রজনাথ বিদ্যারত্নের পুত্র পণ্ডিত মথুরানাথ পদরত্ন কলিকাতায় আসিয়া চৈতন্যলীলার অভিনয় দেখিয়া এতই মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, তিনি গিরিশচন্দ্রের পদধূলি লইতে অগ্রসর হন। আর মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় দর্শকের আসন হইতে উঠিয়া ভাবাবেশে নৃত্য করিতে থাকেন।

স্বর্গীয় বিপিনচন্দ্র পাল এক বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন—

"সে সময়ে আমরা কলেজের ছাত্র, কলকাতার হাল ফ্যাসানের বাবু— র‍্যাংকিন-এর বাড়ীর ডবল ব্রেষ্ট সার্ট গায়ে, তার ওপরে পাকান চাদর শক্ত করে বাঁধা, হাতে ছড়ি। আমরা চৈতন্যলীলার অভিনয় দেখতে ষ্টার থিয়েটারে আসন সংগ্রহ করেছি। প্রথম কয়েকটি দৃশ্য দেখবার পর যখন শিঙ্গা ও খোল করতাল নিয়ে ষ্টেজের উপর হরি সংকীর্ত্তনের দল উপস্থিত হ'লো তখন মনে করলাম—এবার উঠতে হলো। কিন্তু নিতাই ও নিমাই-এর গান শুনে এমনি অভিভূত হলুম যে, আর উঠা হ'লো না। এদিকে বুকের চাদরের বাঁধন খুলে গেছে। চোখ সজল, শেষ অবধি বসে রইলাম। ফিরবার সময় গিরিশচন্দ্রকে ধন্যবাদ না দিয়ে থাকতে পারলাম না।"

গোলকধামগত প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী, যিনি পুরাণব্যাখ্যাতা ও পাঠক হিসাবে সর্ব্বজনপরিচিত—গিরিশচন্দ্রের মহতী স্মৃতিসভায় 'টাউন হলে' বলিয়াছিলেন—

"আমাদের বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে বলিতে পারি, তিনি আমাদের যেমন উপকার করিয়া গিয়াছেন তেমন উপকার আর কেহই করেন নাই। তাঁহার চৈতন্যলীলার নাটকাভিনয় যে কতবার দেখিয়াছি তাহা বলিতে পারি না; কিন্তু যতবারই দেখিয়াছি প্রতিবারই নূতন বলিয়া বোধ হইয়াছে। ভগবান্ শ্রীচৈতন্য স্বয়ং অভিনয় করিয়াছিলেন। ভক্তিরসের তুফান ছুটাইয়া লোককে পাগল করিয়াছিলেন। সে লীলাদর্শন সকলের অদৃষ্টে ঘটিয়া উঠে নাই। গিরিশচন্দ্র ভগবানের সেই লীলা রঙ্গমঞ্চে প্রত্যক্ষ করাইয়া মানুষকে মাতাইয়া তুলিয়াছিলেন। এই অভিনয় দেখিয়া নাস্তিকের হৃদয়ে ভগবদ্ভক্তির সঞ্চার হইয়াছিল। পাপীর অন্তর হরিপ্রেমে বিগলিত হইয়া উঠিয়াছিল। পাপস্পৃহা তাঁহার হৃদয় হইতে চিরদিনের মত মছিয়া গিয়াছিল।"

প্রফুল্ল

স্টার থিয়েটারে সামাজিক নাটক হিসাবে নাট্যাচার্য্য অমৃতলাল বসু কর্ত্তৃক নাট্যাকারে রূপান্তরিত তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের গার্হস্থ্য উপন্যাস 'স্বর্ণলতা'র অর্দ্ধাংশ 'সরলা' নাম দিয়া অভিনীত হয়। এই অভিনয়ের যথেষ্ট সুখ্যাতি হইয়াছিল। বাঙ্গালীর গার্হস্থ্য জীবনের দ্বন্দ্বের মূল এই নাটকে অতি সুন্দরভাবে দেখান হইয়াছে। তাই ইহা অতি সহজেই দর্শকের চিত্ত আকর্ষণ করে। কিন্তু এই চিত্রটি পুরাতন হইলেও সমাজে এখনও ইহা দেখা যায়।

উক্ত নাটকখানির অভিনয়ের পর গিরিশচন্দ্রের বন্ধুরা তাঁহাকে তৎকালীন সমাজের একটি গার্হস্থ্য চিত্র অঙ্কন করিয়া একখানি নাটক লিখিতে অনুরোধ করেন। তাঁহাদের অনুরোধে গিরিশচন্দ্র 'প্রফুল্ল' নাটকখানি রচনা করেন।

বাঙ্গালীর গার্হস্থ্য জীবন দুঃখময়। 'প্রফুল্ল' নাটকখানি সেই গার্হস্থ্য-জীবনের একটি প্রতিরূপ। ইহা একখানি মর্ম্মভেদী বিয়োগান্ত নাটক। তুলনা করিলে বলা যাইতে পারে যে, বাংলা ভাষায় এরূপ নাটক বিরল।

এই নাটকের প্রধান চরিত্র যোগেশ। যোগেশ বিদ্বান্, বুদ্ধিমান্, বিচক্ষণ ও বিত্তশালী, সমাজসেবায়, বন্ধুসেবায়, সংসার সেবায় অকাতরে সে অর্থ ব্যয় করিত। তবে সে নাম-যশের প্রয়াসী ছিল। হৃদয় উন্নত হইলেও তাহাকে কখনও ধর্ম্মানুষ্ঠানে রত দেখা যায় নাই। ভগবানের উপর মানুষের জীবন নির্ভর করে—এই বিশ্বাসের উপরও তাহার কোন আস্থা ছিল না। তাই সে বুদ্ধিমান্ ও বিচক্ষণ হইয়াও প্রতিকূল ঘটনার আঘাতে একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল। চরম অধঃপতনের মুখে গা ভাসাইয়া দিল। আর ফিরিতে পারিল না।

যোগেশের ভূমিকাকে পরিস্ফুট করিবার জন্য নাট্যকার যে কয়টি চিত্র আঁকিয়াছেন তন্মধ্যে রমেশ, জ্ঞানদা ও প্রফুল্ল প্রধান।

যোগেশের মধ্যম ভ্রাতা রমেশ। যোগেশের উদারতার সুযোগ লইয়া তাহার অন্তরস্থ প্রচ্ছন্ন শয়তান যোগেশকে পাপের পথে টানিয়া আনিল। সে অলক্ষ্যে বাক্স বাক্স মদ্য যোগাইয়া দিত আবার প্রকাশ্যে বলিয়া বেড়াইত মদেই দাদার সর্ব্বনাশ হইতেছে। যোগেশের সারা জীবনের উপার্জন, যাহা Reunion Bank-এ জমা ছিল, ব্যাঙ্ক ফেল হওয়ায় নষ্ট হইয়া গেল। টাকার শোকে যোগেশ উন্মাদ হইয়া গেল। সেই সুযোগে রমেশ বিষয়সম্পত্তি বেনামীতে লিখাইয়া লইল। শুধু তাহাই নহে যোগেশের একমাত্র পুত্রের জীবননাশেরও ষড়যন্ত্র করিয়াছিল এবং তাহারই ফলে সে ধরা পড়িয়া জেলে

গেল। "ভগবৎ কৃপার বিমলত্ব বুঝাইবার জন্য কবি দেখাইয়াছেন যে, জাল জুয়াচুরি, মিথ্যা-প্রবঞ্চনা যতই বুদ্ধিমত্তার সহিত সংসাধিত হউক না কেন, কালে তাহা ধরা পড়িবেই।" (নাট্যমন্দির—পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়)

আর যে দুইটি চরিত্র এই নাটকে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, তাহার একটি যোগেশের স্ত্রী জ্ঞানদা আর একটি রমেশের স্ত্রী প্রফুল্ল। জ্ঞানদা পতিপরায়ণা কিন্তু অত্যন্ত সরলা, তাই স্বামীর নির্য্যাতন ভোগ করিয়া তাহাকে দেহত্যাগ করিতে হয়। প্রফুল্লও স্বামীপরায়ণা। তাহা হইলেও স্বামীর আচার আচরণে দুঃখিত। কিন্তু সে প্রতিবাদ করে নাই। কারণ তাহার ধর্ম্মে মতি ছিল। সর্ব্ববিষয়ে স্বামীকে অনুমোদন করিতে পারে নাই, যদি তাহা করিত তাহা হইলে তাহাকে অধর্ম্মের আশ্রয় লইতে হইত। প্রফুল্ল একটি অপূর্ব্ব চিত্র এবং বাংলা নাটকে বোধ হয় নূতনও।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যোগেশের ধর্ম্ম বা ঈশ্বরের উপর কোন আস্থা ছিল না। তাহার ভ্রাতৃপ্রেম অপাত্রে ন্যস্ত হইয়াছিল। তাই যোগেশকে রমেশের কূট-বুদ্ধিতে অত নির্য্যাতন সহ্য করিতে হইয়াছিল।

অবাস্তব হইলেও এই নাটকে মদন দাদা নামে এক 'বিয়ে পাগ্‌লা বুড়ো'র চরিত্র আঁকা হইয়াছে। এই রসিক বৃদ্ধ অন্যান্য কার্য্যে অপটু হইলেও যোগেশের পরিবারে যখন সমূহ বিপদ উপস্থিত হয় অর্থাৎ যোগেশের একমাত্র পুত্র যাদবকে যখন শয়তানের কুমন্ত্রণায় হত্যা করিবার আয়োজন হইতেছিল, তখন এই পাগল মদনদাদা পুলিশ ডাকিয়া তাহার জীবনরক্ষা করে। অনেক সময় দেখা যায়, যাহাকে আমরা অকর্ম্মণ্য অক্ষম বলিয়া মনে করি, তাহার দ্বারা জগতের অনেক মহোপকার সাধিত হয়। এই মদনদাদার চরিত্র তাহারই একটি দৃষ্টান্ত স্থল। প্রফুল্ল নাটকের অভিনয়ে প্রথম প্রথম বাংলার বিশিষ্ট নাগরিকগণ দর্শক হিসাবে উপস্থিত থাকিতেন। একদিন স্টার থিয়েটারে গোপাললাল মিত্র মহাশয় (Vice-Chairman, Cal. Corp.) দর্শক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। পঞ্চম অঙ্কের চতুর্থ গর্ভাঙ্কে যাদবকে অনাহারে রাখিয়া যখন মারিবার চেষ্টা হইতেছে, সেই দৃশ্য দেখিয়া সহসা মিত্র মহাশয় একেবারে আত্মবিস্মৃত হইয়া 'কনষ্টেবল, কনষ্টেবল, পাক্‌ড়াও, পাক্‌ড়াও—খুন হোতা হায়, খুন হোতা হায়' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠেন।

মিনার্ভা থিয়েটারে প্রফুল্ল অভিনয় দেখিতে দেখিতে মনীষী হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়কে বার বার রুমালে চক্ষু মুছিতে দেখিয়াছি। গিরিশচন্দ্র স্বয়ং যোগেশের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইতেন। 'আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল' যোগেশের এই সামান্য কাটি কথার মধ্যে কী সুগভীর নৈরাশ্য ও বেদনা

অভিব্যক্ত। বাঙালীর দুঃখ-কষ্ট-শোক-তাপের সংসারে আশাহত মানুষের মুখে গভীর দীর্ঘ নিঃশ্বাসের সঙ্গে এই উক্তির পুনরাবৃত্তি অহরহই শুনা যায়।

তপোবল

'তপোবল' নাটকের মূল আখ্যান—বাল্মীকির মহাকাব্য রামায়ণ; কিন্তু গিরিশচন্দ্রের স্বষ্টি-চাতুর্য্য ও অভিনয়-নৈপুণ্যে ইহা একখানি নূতন নাটক-রূপে প্রতিভাত। ইহাই গিরিশচন্দ্রের শেষ কীর্ত্তি ও তাঁহার মহাকবি-প্রতিভার শেষ দীপ্তি। দেবদেবীগণকে, অপ্সরাগণকে এবং মর্ত্তধামের ব্রাহ্মণগণকে বিশেষতঃ আদর্শ ব্রাহ্মণকে যেভাবে তিনি অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা অভিনব ও অপূর্ব্ব। তপস্যার গৌরব ও ব্রাহ্মণের প্রকৃত ব্রাহ্মণত্ব তাঁহার নাটকে যাহা স্বতঃস্ফূর্ত্তভাবে উজ্জ্বল, তাহা অন্যত্র কোথাও মিলিবে কি-না জানি না। বার্দ্ধক্যের রচনা হইলেও এবং শেষ রচনা হইলেও জীবন-মধ্যাহ্নে রচিত তাঁহার নাটকাবলীর গৌরবে গৌরবান্বিত। ভাবে, ভাষায় রসবৈচিত্র্যে ও নানা চরিত্রের ক্রমবিকাশে ইহা একখানি প্রথম শ্রেণীর নাটক।

আমরা বেশী আলোচনা করিব না; শুধু এইটুকু বলিতে পারি আদর্শ ব্রাহ্মণ বশিষ্ঠ ও ক্ষত্রিয়তেজে উজ্জ্বল বিশ্বামিত্র এই দুই মহাচরিত্র যেভাবে তিনি অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা বঙ্গীয় নাট্যসাহিত্যে অমর হইয়া থাকিবে।

ব্রাহ্মণত্বের আদর্শ গিরিশচন্দ্রের বশিষ্ঠে পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। সেইরূপ ক্ষত্রিয়ত্বের পূর্ণ রূপ বিশ্বামিত্রে পাওয়া যায়।

স্ত্রী চরিত্রগুলি—সুনেত্রা, অরুন্ধতী মাত্র অভিনব নহে, পাতিব্রত্য মহিমায় মহীয়সী। স্বর্গের অপ্সরাগুলিকেও তিনি নূতন আলোকে চিত্রিত করিয়াছেন। এরূপ চিত্র বিরল। গিরিশচন্দ্রের বৈশিষ্ট্য এই নাটকের সদানন্দ চরিত্রে বিকশিত। সদানন্দ বিদূষক; কিন্তু নাটকের আখ্যানবস্তুর সঙ্গে সংযুক্ত। জনার বিদূষক—তপোবলের সদানন্দ—মুকুলমুঞ্জরার বরুণচাঁদ—ইংরাজীতে Jester বলিতে যাহা বুঝায়—তাহা নহে। এগুলি গিরিশচন্দ্রের নিজ স্বষ্টি।

সদানন্দ চিত্রের ন্যায় নিজ স্বষ্ট চরিত্র না হইলেও বেদমাতা ও ব্রহ্মণ্যদেব দুটি দেবচরিত্র যেভাবে গিরিশচন্দ্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদের আদর্শ লইলে মানব উন্নত হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। অথচ ব্রহ্মণ্যদেবকে মানব-চরিত্রের ন্যায় পরিস্ফুট করিলেও অপরূর্ব্ব রসের সহিত তাঁহাকে এমন সমুজ্জ্বল

করিয়াছেন যে, মনে বিস্ময় উৎপাদন করে। সেইরূপ বেদমাতা চরিত্রও করুণায় ও হিতৈষণায় অপরূপ গাম্ভীর্য্য ও মাধুর্য্যে পরিস্ফুট হইয়াছে। তপোবলে বলীয়ান্ হইয়া বিশ্বামিত্র কয়েকটি নূতন সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু সেই সৃষ্টিকে গিরিশচন্দ্র রূপায়িত করিতে বৈজ্ঞানিক ক্রমবিকাশের আভাস দিয়াছেন।

এই নাটকের শেষ দৃশ্যে যখন বশিষ্ঠদেব তৃতীয় বার হোমাগ্নিতে 'বশিষ্ঠ নিধনঃ স্বাহা' মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া নিজ বিনাশসাধনে উদ্যত, তখন বিশ্বামিত্র সমস্ত অভিমান ত্যাগ করিয়া বশিষ্ঠদেবকে নিরস্ত হইতে অনুরোধ করিয়া বলিলেন—বশিষ্ঠদেবের আদর্শ জগতে থাকুক আমি তাহার পরিবর্ত্তে ব্রহ্মর্ষিত্ব লাভ করিতে চাহি না। তখন বশিষ্ঠদেব অভিমান ও অহঙ্কারশূন্য নিজ যজমান বিশ্বামিত্রকে আলিঙ্গন দান করিয়া উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিলেন—বিশ্বামিত্র তুমি এই মুহূর্ত্ত হইতেই ব্রহ্মর্ষি।

তপোবল নাটকের শেষ দৃশ্যটি অননুকরণীয়। উহা সমগ্র উদ্ধৃত না করিলে সম্যক্ বুঝান যায় না। পুঁথি বাড়িয়া যায় বলিয়া তপোবল নাটকের প্রধান উদ্দেশ্য—তপস্যার দ্বারা কি সাধ্য কি অসাধ্য যাহা বিশ্বামিত্র-মুখে উচ্চারিত নিম্নে সেইটুকুই মাত্র উদ্ধৃত করিয়া আমরা বিদায় লইতেছি।

"বিশ্বামিত্র—হে মানব,
ব্রহ্মর্ষিত্ব, দেব-দ্বিজ-কৃপায় লভিয়ে
আকাঙ্ক্ষা নহেক সম্পূরণ।
আকাঙ্ক্ষা আমার—
নরত্ব দুর্লভ অতি—বুঝুক মানব।
নাহি জাতির বিচার,
লভে নর উচ্চ পদ তপোবলে।
তপ দৃঢ় সহায় জীবনে;
প্রভাবে যাহার,
ঘুচে নীচ সংস্কার,
মলিনত্ব হয় বিদূরিত,
জন্মে আত্মবোধ,
ঘুচে তায় জনম-মরণ-ভ্রম;
উচ্চ হতে উচ্চতর স্তরে,
তপোবলে করে আরোহণ।

তপ অতুল সম্পদ,
দানে সেই উচ্চ পদ,
যেই পদ আকাঙ্ক্ষা যাহার।

সাধ্যাসাধ্য নাহিক বিচার,
পায় সর্ব্ব অধিকার,
হীনজন অতি উচ্চ হয় তপোবলে।

বেদমাতা কোলে লন তারে,
বিহরে ব্রহ্মণ্যদেব হৃদয় মাঝারে,
তপের প্রভাব বুঝ, মানবমণ্ডল।

যদি মম উপদেশ করহ গ্রহণ,
বুঝিব সফল মম শরীর ধারণ।
তপ, তপ, হও তপাচারী।"

গিরিশচন্দ্র ও সেক্সপীয়র

ইংরাজীতে একটা কথা আছে 'Comparisons are odious'. গিরিশচন্দ্র এদেশের রচিত নাটকের সহিত ইংলণ্ডের বা অন্য কোন দেশের নাট্যসাহিত্যের তুলনামূলক আলোচনা সম্বন্ধে নিজের যে অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম এই যে, সমসাময়িক না হইলে, সমদেশবাসী না হইলে, সমধর্ম্মাবলম্বী না হইলে দুই জন লেখকের রচনার তুলনামূলক সমালোচনা করা সুসঙ্গত হয় না। যখন তখন আমরা Shakespeare-এর সহিত এদেশের নাট্যকার বা সাহিত্যিকের তুলনা করিতে যাই, কিন্তু তাহা সমীচীন নহে। দুই জন মহাকবিই নিজ নিজ দেশের কৃষ্টি ও চিন্তাধারার পরিপ্রেক্ষিতে নাটকাদি রচনা করিয়াছেন; তথাপি উভয় দেশের ভাষা, আচার-ব্যবহার, চিন্তাধারা ও আদর্শের মৌলিক পার্থক্য এবং যুগের ব্যবধান থাকায় পরস্পরের সহিত তুলনা সম্ভব নহে। আমরা সেই কারণে গিরিশচন্দ্রের সহিত Shakespeare-এর তুলনামূলক আলোচনা হইতে বিরত রহিলাম।

রামনারায়ণ, মধুসূদন, দীনবন্ধু ও মনোমোহন প্রভৃতির রচিত বাংলা নাটকাবলীতে যে ভাষা বা নাট্য প্রতিভার পরিচয় আছে তাহার সহিত তুলনা করিলে গিরিশচন্দ্রের নাটকের ভাব, ভাষা, নাটকীয় সংস্থান ও বিবিধ চরিত্রাবলী যে উন্নত সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। Shakespeare-এর নাটকাবলী পাঠ করিয়া যাঁহারা পাশ্চাত্যের পরিবেশিত রসাস্বাদনে পরিতৃপ্ত

হইয়াছিলেন, সেই সব ইংরাজী শিক্ষিত বাঙ্গালী পাঠক ও দর্শকের অনেকেই গিরিশচন্দ্রের নাটকাবলী পাঠ বা উহাদের অভিনয় দর্শন করিয়া উচ্ছ্বসিতভাবে প্রশংসা করিয়াছেন।

গিরিশচন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের চৌকাঠ পার হন নাই ; কিন্তু তাহা না হইলেও জ্ঞানসমুদ্রের তীরে বসিয়া ধ্যানমগ্ন ঋষির ন্যায় সাধনা করিয়া তিনি যে শক্তি-সম্পদ্ আহরণ করিয়াছিলেন, তাহা বাস্তবিকই বিস্ময়কর। এই শক্তির বলেই Shakespeare-এর ন্যায় জগদ্বরেণ্য কবির রচিত 'Macbeth'-এর মত নাটকের অনুবাদ করিতে তিনি সক্ষম হন। দেশীয় ধর্ম্ম ও দর্শনের দুরূহ বিষয়সমূহ নাটকের মধ্য দিয়া অপূর্ব্বভাবে সাধারণের বোধগম্য করিয়া পরিবেশন করা সামান্য শক্তির পরিচায়ক নহে। এ বিষয়ে গিরিশচন্দ্রের সমকক্ষ কোন নাট্যকার আছেন কি-না তাহা আমাদের জানা নাই।

গিরিশচন্দ্রের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে সামান্য কয়েকটি মতামত উদ্ধৃত করিয়া আমরা বর্ত্তমান প্রসঙ্গ শেষ করিব।

গিরিশচন্দ্রের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে মতবৈষম্য

গিরিশচন্দ্র সংখ্যা হিসাবে ৯০খানি নাটক, গীতিনাট্য, নাটিকা, প্রহসন ও পঞ্চরঙ্গ রচনা করিয়াছেন। ইহার মধ্যে মাত্র সাতখানি ব্যঙ্গনাট্য প্রকাশিত হয় নাই।

অনেকে বলেন, বাংলা ভাষায় এ যাবৎ উৎকৃষ্ট রসোত্তীর্ণ কোন নাটক রচিত হয় নাই। যাঁহারা উক্ত প্রকার মতের পরিপোষক তাঁহাদের সহিত বিতর্কে প্রবৃত্ত হইবার ইচ্ছা আমার নাই। আমি শুধু কয়েকটি মন্তব্য উদ্ধৃত করিয়া দেখাইব যে, গিরিশচন্দ্র ও তাঁহার নাটকাবলী সম্বন্ধে বিদ্বজ্জন কি ধারণা পোষণ করিতেন।

বঙ্গবাসী কলেজের স্বর্গত অধ্যাপক ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় গিরিশ-চন্দ্রের তিরোধানের পর 'মানসী'তে লিখিয়াছিলেন—

"গিরিশচন্দ্রকে বঙ্গের গ্যারিক্ বলা হয়। ইহাতে অনুপ্রাস বেশ জমে বটে, কিন্তু আমার বিবেচনায় ইহাতে তাঁহাকে খাটো করা হয়। গ্যারিক্ শ্রেষ্ঠ অভিনেতা ছিলেন বটে, কিন্তু নাটককার হিসাবে তিনি নিতান্ত নগণ্য। পক্ষান্তরে গিরিশচন্দ্র নটলীলা ও নাটক প্রণয়নে সমান কৃতিত্ব দেখাইয়া গিয়াছেন। অতএব যদি গিরিশচন্দ্রকে কোন ইংরাজের সহিত তুলনা করিতে হয়, তাহা হইলে শেক্স্পীয়ারের সঙ্গেই তুলনা করা সঙ্গত। উভয়েই একাধারে নট ও নাট্যকার ছিলেন। নটলীলায় গিরিশচন্দ্র শেক্স্পীয়ার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ—

ইহা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। শেক্‌স্‌পীয়ারের ন্যায় তিনিও ঘনিষ্ঠভাবে রঙ্গমঞ্চের সহিত জড়িত ছিলেন বলিয়া তাঁহার নাটকে acting quality প্রভূত পরিমাণে পাওয়া যায়। এরূপ হাতে-কলমে জ্ঞান না থাকিলে উৎকৃষ্ট নাটক রচনা করা একপ্রকার অসম্ভব।"

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অন্যতম কর্ণধার বিচারপতি সারদাচরণ মিত্র মহাশয় ১৩১৮ সালের বাৎসরিক অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণে বলিয়াছিলেন—

"মহাকবি গিরিশচন্দ্র ইউরোপীয় কাব্য ও ঐতিহাসিক সাহিত্যে সুন্দররূপে শিক্ষিত ছিলেন। তাঁহার ন্যায় সুশিক্ষিত বঙ্গবাসী অতি বিরল ছিল। কি সামাজিক, কি ঐতিহাসিক, কি পৌরাণিক সর্ব্ববিধ চরিত্রগঠনে তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন। তাহাতে দেশীয়ত্বের পরিমাণ খুব বেশী ছিল। তাঁহার নাটকাদি বঙ্গসাহিত্যের চিরস্থায়ী অলঙ্কার। বর্ত্তমান নাট্যপ্রণালী ও নাট্যাভিনয় তাঁহারই অসাধারণ উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দিতেছে—'তপোবল' তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তি।"

অধ্যাপক রাধাকমল মুখোপাধ্যায় তাঁহার 'বর্ত্তমান বাংলা সাহিত্য' নামক নিবন্ধে লিখিয়াছেন—

"বাংলা সাহিত্যের গঠন ও ক্রমবিকাশে বঙ্কিমচন্দ্রের যে স্থান, বাংলার নাট্যসাহিত্যে গিরিশচন্দ্রেরও ঠিক তদনুরূপ স্থান। তাঁহার ভাব ও ভাষা, তাঁহার ছন্দ ও উচ্চারণ বর্ত্তমান নাট্যসাহিত্যের ছাঁদ ঠিক করিয়া দিয়াছে।"

মহাকবি গিরিশচন্দ্র সম্বন্ধে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ যে প্রশংসাবাণী উচ্চারণ করিয়াছিলেন, তাহা এই—

"গিরিশচন্দ্রকে আমি মহাকবি বলি কেন? যার কবিতায় ধর্ম্ম নাই, প্রাণ নাই সে কবি অধিক দিন বাঁচে না। মহাকবি বলি কাকে? যার কবিতায়, গানে, রচনায়, ধর্ম্ম আছে, জাতীয়তা আছে, জাতির বৈশিষ্ট্য আছে, তাহাকেই বলি মহাকবি। আমি আমার 'নারায়ণ' পত্রে দেখাইয়াছি—কবিতার মধ্যে জাতীয়তার কতবার উত্থান পতন হইয়াছে। চণ্ডীদাসের পর মহাপ্রভুর সময়ে এই ভাব বিশেষরূপে জাগিয়া উঠিয়াছিল। তাহার পর আবার ভারতচন্দ্রের সময়ে অনেকটা মলিন হইয়া যায়, পরে রামপ্রসাদে তাহা জাগিয়া উঠে, আবার মলিন হইয়া গিরিশ ঘোষে তাহা জাগিয়া উঠিয়াছিল। গিরিশবাবুর কবিতায়, নাটকে ও গা ন আমরা জাতীয়তা পাই, আর ধর্ম্ম ও জাতীয়তার দিকে প্রকৃষ্ট পথ খুঁজিয়া পাই।

ইউরোপীয় শিক্ষার আদর্শে আমার আস্থা নাই। কলা কলাই, ইহার অপর উদ্দেশ্য নাই; এই যাহাদের অভিমত—তাহারা ঘোর জড়বাদী; ভারত-

বর্ষের কাল্‌চার সম্বন্ধে তাঁহাদের বলিবার অধিকার নাই। ধর্ম্ম ও জীবন অচ্ছেদ্য—যিনি একের সহিত অপরের পার্থক্য করেন, তিনি উভয় দিকই হারাইয়া ফেলেন। এই বৈশিষ্ট্যেই গিরিশচন্দ্রকে যশের অন্বেষণে ইউরোপ, আমেরিকা বা সমুদ্রের পরপারে যাইতে হয় নাই। তিনি দেশবাসীর যথাথ পরিচয় পাইয়া দেশীয় ভাবে খাঁটি দেশের ভাষায় বাংলা দেশে বসিয়াই দেশ-মাতৃকার সেবা করিয়াছেন। এইজন্যই গিরিশ মহাকবি—দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি। বেশী দেরী নাই, এমন দিন আসিবে যখন পাশ্চাত্ত্য জাতি এই বাংলায় আসিয়া বিদ্যালয়ের ছাত্রের ন্যায় আমাদের ধর্ম্ম, সাহিত্য, কাব্য, নাটক আলোচনা করিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ ও গৌরবান্বিত মনে করিবে। তখনই তাহারা গিরিশচন্দ্রের প্রকৃত পরিচয় পাইবে—বুঝিতে পারিবে, তিনি কত বড়।"

টাউনহলের স্মৃতিসভায় বিপিনচন্দ্র পাল বলিয়াছিলেন—

"প্রেমতত্ত্ব প্রচার ছিল গিরিশচন্দ্রের বিশেষত্ব। কি পার্থিব, কি ঐশী প্রেম তাঁহার শক্তিশালী লেখনী সমভাবে চিত্রিত করিয়াছে। শুধু তাহাই নহে। ক্ষুদ্র কীট হইতে মানবের উপর জগৎপিতা ও জগন্মাতার অনির্ব্বচনীয় ভালবাসা তাঁহার নাটকে যে রসধারা প্রবাহিত করিয়াছে, তাহা পাঠ করিলে পাপী তাপী এমন কি কঠোর নাস্তিকের হৃদয়ও পরমানন্দে বিগলিত হয়। হাস্যরস স্ফুরণে অন্তর্দ্বন্দ্বের বিকাশে, নাটকীয় সংস্থান (situation) এবং ঘটনার পুষ্টিতে ও চরিত্রসৃষ্টিতে তাঁহার অসামান্য ক্ষমতা ছিল। প্রেম-ভক্তি-ভালবাসা, ত্যাগ-বিবেক-বৈরাগ্য প্রভৃতির চিত্রবিকাশ ছিল তাঁহার নাটকের প্রধান লক্ষ্য।"

উক্ত স্মৃতিসভায় পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বলিয়াছিলেন—

"শৈবালদাম-বিজড়িত পঙ্কপূর্ণ সরোবরেই পঙ্কজ শতদল কমল ফুটিয়া থাকে। ধনীর মণিকুট্টিমে পদ্ম ফুটে না। শতদল কমলই বাণীর পূণার্ঘ্যের উপযোগী সম্ভার। গিরিশচন্দ্র বাঙ্গালার পঙ্কিল ভাবপূর্ণ সরোবরে শতদল কমল।"

অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক মতিলাল ঘোষ বলিয়াছিলেন—

"গিরিশচন্দ্র যদি কেবল বিল্বমঙ্গল ও চৈতন্যলীলা রচনা করিয়াই ক্ষান্ত হইতেন, তাহা হইলেও নাট্যজগতে সাহিত্যজগতে অমর বলিয়া পরিগণিত হইতেন।"

সুরেশচন্দ্র সমাজপতি বলিয়াছিলেন—

"গিরিশচন্দ্রের বিয়োগে বাঙ্গালা সাহিত্যের যে ক্ষতি হইয়াছে অদূর ভবিষ্যতে তাহা পূর্ণ হইবার নহে। * * * রাজা রামমোহন রায়ের

পর গিরিশচন্দ্রের ন্যায় সৃষ্টিকুশলী আর কেহ জন্মান নাই। তাঁহার শেষ নাটকে তপোবলের ব্রহ্মর্ষি বিশ্বামিত্রের ন্যায় তিনিও বঙ্গসাহিত্যে স্বর্গীয় দ্যুতি বিকীরিত করিয়া গিয়াছেন। গিরিশচন্দ্র মৌলিক প্রতিভাসম্পন্ন। তিনি এক একটি চরিত্রকে উজ্জ্বল চিত্রের ন্যায় পরিস্ফুট করিয়া গিয়াছেন। গিরিশচন্দ্র সাধক ছিলেন। তিনি রামকৃষ্ণের ভক্ত শিষ্য, আমাদের শাস্ত্রকার বলিয়াছেন—শিল্প ধ্যানগম্য। তিনিও চিরজীবন এক অপূর্ব্ব কল্পলোকের সৃষ্টি করিয়া আপন মানসী দেবীর ধ্যান করিয়াছিলেন। * * গিরিশচন্দ্র বঙ্গসাহিত্যে যে কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন তাহা তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিবে।"

দেশ-বিদেশে গিরিশচন্দ্রের প্রতিভার কিরূপ সমাদর হইয়াছে অমরেন্দ্রনাথ দত্ত-প্রদত্ত বিবরণী হইতে তাহার কিছুটা ধারণা করা যায়:—

"১। নাট্যসম্রাট্ গিরিশচন্দ্রের দেবনাটক 'বুদ্ধদেব-চরিত' ইংরাজীতে অনূদিত হইয়া লণ্ডনের কোর্ট থিয়েটারে মহাসমারোহে অভিনীত হইয়াছে।

২। গিরিশচন্দ্রের 'নলদময়ন্তী' নাটক ফরাসী ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। ফ্যাসনের লীলাভূমি বিলাসিনী ফ্রান্সেও গিরিশচন্দ্রের প্রতিভার সমাদর হইয়াছে।

৩। গিরিশচন্দ্রের 'বিল্বমঙ্গল' নাটক বহুদিন পূর্ব্বে মিণ্টের ভূতপূর্ব্ব দেওয়ান রায় বৈকুণ্ঠনাথ বসু বাহাদুর ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়াছিলেন, এবং পরলোকগতা ভগিনী নিবেদিতা তাহা সংশোধন করিয়া দিয়াছিলেন।

৪। গিরিশচন্দ্রের চিত্তচমকপ্রদ নাটক 'বিষাদ' নাটক 'দুখিয়া' নামে হিন্দীতে অনূদিত হইয়া এলাহাবাদে অভিনীত হইয়াছে। অনূদিত পুস্তকও বহুদিন পূর্ব্বে বাহির হইয়াছিল। 'পূর্ণচন্দ্র' নাটকেরও হিন্দী অনুবাদ হইয়াছিল।

৫। গিরিশচন্দ্রের স্বর্গারোহণের কিছুদিন পূর্ব্বে গোবিন্দ প্রসাদ নামে জনৈক বিহারবাসী 'শঙ্করাচার্য্য' নাটকের অনুবাদের অনুমতিপত্র প্রাপ্ত হইয়া-ছিলেন।

৬। কলিকাতা ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ বহু ভাষাভিজ্ঞ পণ্ডিত স্বর্গীয় হরিনাথ দে গিরিশচন্দ্রের 'প্রফুল্ল' নাটকের ইংরাজী অনুবাদে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার অকালমৃত্যুতে অনুবাদ সম্পূর্ণ হয় নাই। কেবলমাত্র তাঁহার কয়েকটি কবিতা ও গান তিনি ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়া গিয়াছেন।

৭। স্বামী বিবেকানন্দের কীর্ত্তিমুখর আমেরিকায় গিরিশচন্দ্রের গুণমুগ্ধ অসংখ্য ভক্ত বিদ্যমান। আমেরিকাবাসী যুবকগণ তথায় হিন্দু ছাত্রগণের সহিত মিলিত হইয়া নাট্যসম্রাটের স্মৃতির প্রতি সম্মানের নিদর্শনস্বরূপ তাঁহার পুত্র সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়কে একটি প্রস্তরফলক পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।

৮। গিরিশচন্দ্র 'মহাকবি' বা 'কবিবর'—ইহা লইয়া একটা প্রসঙ্গ একসময় উত্থিত হইয়াছিল। কলিকাতা টাউন হলে গিরিশচন্দ্রের শোকসভায় তাঁহাকে 'মহাকবি'র আখ্যায় বিভূষিত করিয়া সমস্ত প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পর, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের জনৈক সহকারী সম্পাদক কর্ত্তৃক কোন একটি সভার বিজ্ঞাপনে গিরিশচন্দ্রকে 'মহাকবি' বিশেষণে বিশেষিত না করিয়া 'কবিবর' শব্দ প্রয়োগ করা সম্বন্ধে প্রবন্ধলেখক ও শিক্ষিতকুলবরেণ্য বঙ্গমাতার কৃতী সন্তান পুরুষসিংহ মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুত সারদাচরণ মিত্র মহোদয়ের সহিত পত্র ব্যবহার হয়। মনীষিবর সারদাচরণ যে উত্তর দান করেন তাহার প্রতিলিপি নিম্নে প্রদত্ত হইল—

ওঁ

গুরুধাম—৺কাশীধাম,

১৭ই আশ্বিন, ১৩১৯

সপ্রণাম নিবেদন—

আপনার ১১ই আশ্বিন তারিখের পত্রপ্রাপ্তির পূর্ব্বেই 'কবিবর' শব্দযুক্ত পত্র পাইয়াছিলাম। একখানি পত্রে কি হইবে, আমরা যখন সাধারণ সভায় গিরিশচন্দ্রকে 'মহাকবি' বলিয়া কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছি তখন ক্ষুদ্রচেতারা কি করিতে পারিবে। ১২ই অক্টোবর প্রাতঃকালে আমি কলিকাতায় পেঁাছিব। সাক্ষাতে সমস্ত কথা হইবে। আমরা সকলে ভাল আছি।

শ্রীসারদাচরণ মিত্র"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ভক্ত গিরিশচন্দ্র

আপনারা সকলেই জানেন যে, মহাকবি গিরিশচন্দ্র জীবনমধ্যাহ্ন হইতে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনালোকে নিজ জীবনগঠনে সচেষ্ট হন। তাঁহার রচনাবলীতেও শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাব অপরিসীম। ভক্তিপ্রবণ হইলেও কোন সাধারণ মানুষকে গুরু বলিয়া স্বীকার করা অথবা তাঁহার নিকট আত্মদান করিয়া দীক্ষাগ্রহণ করার পাত্র গিরিশচন্দ্র ছিলেন না। তিনি জিদ করিয়াই বলিতেন —"আমার মতন মানুষ আর একজন মানুষকে গুরু বলিয়া স্বীকার করিবে কেন? গুরু মুক্তিদাতা, পরিত্রাতা। যিনি অখণ্ডমণ্ডলাকার চরাচর পরিব্যাপ্ত শ্রীভগবানের সহিত সম্পর্কিত করিয়া দিতে পারেন তিনি গুরুপদবাচ্য বা গুরুস্থানের অধিকারী হইতে পারেন।" তিনি ইহাও বলিতেন—"বাবা তারকনাথ যদি মানবদেহ ধারণ করিয়া আমাকে দীক্ষা দিতে আসেন—তবেই আমার দীক্ষা লওয়া হইবে। বিশ্বগুরু তারকনাথই গুরুস্থানের অধিকারী।" এই সকল বিষয় লইয়া তিনি মনে মনে যতই জল্পনা করিতে লাগিলেন, মনের সংশয়ও ততই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এই সময় এক নিদারুণ মানসিক অস্বস্তির মধ্যে তাঁহার দিন কাটিতেছিল। গিরিশচন্দ্র ভাবিতে লাগিলেন, তারকনাথ ব্যাধি হরণ করেন। তারকনাথের শরণাপন্ন হইলেন। কেশ-শ্মশ্রু রাখিলেন, নিত্য গঙ্গাস্নান, শিবপূজা ও হবিষ্যান্ন ভোজন করিতে লাগিলেন। প্রতি বৎসর শিবরাত্রির ব্রতও করিতেন। প্রার্থনা—"তারকনাথ, আমার সংশয় ছেদন কর। যদি গুরু উপদেশ ব্যতীত সংশয় দূর না হয়, তুমি আমার গুরু হও।" কিছুদিন এইরূপ করিতে করিতে তারকনাথের কৃপায় গিরিশচন্দ্রের হৃদয়ে ক্রমে বিশ্বাস বদ্ধমূল হইতে লাগিল। গিরিশচন্দ্র এই সময় তাঁহার কোন আত্মীয়কে বলিয়াছিলেন—আমার মনে হয়, এক শতাব্দীর উন্নতি আমার একদিনে হইতেছে। কিছুদিন এইরূপ নিয়ম ও ব্রত পালন করিবার পর শ্রীভগবানের প্রত্যক্ষ দর্শনের জন্য গিরিশচন্দ্রের মন একান্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল। শুনিয়াছিলেন, কালীঘাট সিদ্ধপীঠস্থান, সেখানে সকল কামনাই সিদ্ধ হয়। প্রতি সপ্তাহে শনি ও মঙ্গলবারে নিয়মিতরূপে গিরিশচন্দ্র কালীঘাটে যাইতেন এবং কালীঘাটে হাড়কাঠের নিকট বসিয়া তিনি সমস্ত রাত্রি জগদম্বাকে

ডাকিতেন। তাঁহার ধারণা ছিল, এই স্থান হইতে কত প্রাণী কাতর প্রাণে মাকে ডাকিয়াছে, এই স্থানের উপর নিশ্চয় মার দৃষ্টি আছে। ক্রমে তাঁহার হৃদয়ে বিশ্বাসের সহিত ভক্তি প্রবাহিত হইতে লাগিল,—"গিরিশচন্দ্র চৈতন্য-লীলা লিখিলেন*—পরমগুরুলাভের পথ মুক্ত হইল।" তিনি পরমহংসদেবের সম্পর্কে আসিয়া আপনাকে চিরবিক্রীত করিয়া দিলেন। কয়েক দিন দেখা সাক্ষাৎ ও আলাপের পর একদিন প্রসঙ্গক্রমে গিরিশচন্দ্র শ্রীশ্রীঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করেন—"মহাশয়, আমার কিছু কি হবে?"

ঠাকুর বলিলেন—"না হবার কারণ কি? তুমি কে, তুমি কি?"

গিরিশচন্দ্র বলিলেন—"মহাশয়, আপনি আমাকে জানেন না। আমি যেখানে বসি সেখানকার মাটির নীচে সাত হাত পর্য্যন্ত পাপের স্রোত বয়। আমাদের মতন পাষণ্ডের কি তুলনা আছে?"

ঠাকুর বলিলেন—"তাতে কি এসে যায়! তুমি তো জানো এবং সকলেই জানে চাঁদামামা সকলেরই মামা। সাধুরা তপস্যা করে রাত জেগে, তাঁদের তিনি আলো দেন। আবার সেই রাত্রিতে দস্যুরা যখন চুরি করতে যায়, ডাকাতি করতে যায়, তাদেরও তিনি আলো দেখান। পতিতপাবন বলে যখন একজন আছেন, তোমার এত ভাবনার কারণ কি? পুরাণে কালীয় সাপের কথা আছে, সে বিষোদ্গার করে মারতো, পতিতপাবন শ্রীকৃষ্ণ তাকে দমন করেন। যিনি বিষ দিতে পারেন, তিনি দমনও করতে পারেন; সকলই তাঁহার খেলা।"

গিরিশচন্দ্র:—"তা হলে আমার মত পাষণ্ডেরাও একদিন না একদিন উদ্ধার পাবে?"

শ্রীরামকৃষ্ণ—"পাবেই পাবে, নিশ্চয়ই পাবে। পতিতপাবন উদ্ধার করতে পারেন না, এমন পাপী কি জগতে জন্মেছে। পাপ-তাপ-হরণ পতিতপাবন যাকে আশ্রয় দেন তার উদ্ধার হবার কোন ভয় থাকে কি? হাজার বছরের অন্ধকার ঘরে একটা দেশলাইয়ের কাঠি জাল্‌লেই তৎক্ষণাৎ সমস্ত ঘরটা আলোকিত হয়। পতিতপাবনের আশ্রয় নিলে সকল দোষ, পাপ, তাপ মুহূর্ত্তে নাশ হয়। তুমি নিজেকে কর্ত্তা বলে মনে করেছ, তাই জন্যই অত ভয়। অজ্ঞানেরাই আপনাদের কর্ত্তা বলে মনে করে। ঈশ্বরই একমাত্র কর্ত্তা। জীব যন্ত্র মাত্র।"

* গিরিশচন্দ্র, ২য় খণ্ড, অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়।

ধীরে ধীরে এইভাবে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া গিরিশচন্দ্রের মনশ্চাঞ্চল্য অপনোদিত হইল এবং তিনি গুরুপদাশ্রয় লাভ করিলেন।

মহাকবি গিরিশচন্দ্র তাঁহার 'কালাপাহাড়' নাটকে কয়েকটি চরিত্রের মধ্যে নিজের ভাব ও তাঁহার সহিত বিশ্বগুরুর সম্পর্ক অঙ্কিত করিয়াছেন। কালাপাহাড়ে তিনি বীরেশ্বর-চরিত্রের মধ্যে আপনাকে ও চিন্তামণি-চরিত্রে শ্রীশ্রীঠাকুরকে অঙ্কিত করিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত কথোপকথনগুলি, আসুন, আমরা মিলাইয়া দেখি।

"বীরেশ্বর—আমি কে জানেন?

চিন্তামণি—যেই হও না কেন চাঁদামামা সকলেরই মামা। ঈশ্বর সবারই ঈশ্বর—তোমারও আমারও।

বীরেশ্বর—আমি ব্রহ্মদৈত্য, প্রেত, ভূত।

চিন্তামণি—ভূতনাথ আশ্রয় দেবেন।

বীরেশ্বর—শুন পরিচয়, জন্ম মম ব্রাহ্মণের
ঘরে, কিন্তু অবিদ্যার বরে, করিলাম
অবিদ্যা অর্চ্চনা, ধন জন প্রতিষ্ঠার
নিয়ত কামনা মম, বাসনা সাগর
উথলিল বালক হৃদয়ে; বাসনার
মোহবশে, বালক-বয়সে ব্রহ্মচর্য্য
আচরণ—কামের দমন আকিঞ্চন
নহে—অবিরাম কামতৃপ্তি অভিলাষ।
নিত্য যোগ-যাগ, দেব অনুরাগ, অষ্ট-
সিদ্ধি আশা জাগে মনে মনে; শবাসনে
বসিয়ে শ্মশানে, ধ্যানমগ্ন কাপালিক,
আসব-সেবন-পাত্র শবের কপাল,
নরহত্যা, ভ্রূণহত্যা সতীত্ব-ভঞ্জন,
প্রবল ইন্দ্রিয় বলে নির্ভীক হৃদয়;
পরম আরাধ্যা ত্যজি মহাবিদ্যা, দাস
অবিদ্যার, ঘুচিবে কি দাসত্ব শৃঙ্খল?

চিন্তামণি—অভিমান কর পরিহার, চূর্ণ কর
বল অবিদ্যার, জেন সার, অহঙ্কার
নরক দুস্তর, শক্তি কার? মূলাধার
ভগবান্ শক্তির আকর, ভাবে মুগ্ধ
নর শক্তিধর আপনারে; জলধরে
বর্ষে বারিধারা, চলে প্রণালী বহিয়ে
জল, জল নহে প্রণালীর; জেন স্থির,
শক্তি সেই মত। অনিবার্য্য, ফলে কার্য্য
ঈশ্বর-ইচ্ছায়, হয় মানবনিচয়
ফলভোগী তায়—কর্ত্তাজ্ঞানে আপনায়।
'অহং অহং' ত্যজ বিচক্ষণ। জপ
'তুহুঁ তুহুঁ, নাহম্ নাহম্'; পাশমুক্ত
হবে, হৃদিপদ্মে বসিবেন শান্তি দেবী।"

গুরুকরণের সম্বন্ধে গিরিশচন্দ্রের পূর্ব্বোক্ত মনোভাবের আর একটি চিত্র 'কালাপাহাড়' নাটকের অন্যত্র আছে। এই চিত্রখানি স্বরূপচিত্র। গুরুকরণের উদ্দেশ্য ঈশ্বরলাভ। ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে অনেকের বিশ্বাস থাকিলেও, তাহা স্থির অচঞ্চল নহে। আবার কাহারও কাহারও বিশ্বাস তো আদৌ নাই। মনের এইরূপ দোদুল্যমান অবস্থা গিরিশচন্দ্রের এক সময় ছিল। মানুষ মানুষের গুরু হইতে পারে কি-না, আর ঈশ্বর আছেন কি-না এই দুইটি সংশয়াত্মিকা বুদ্ধির চিত্র আমরা কালাপাহাড় হইতে উদ্ধৃত করিতেছি। এখানে কালাপাহাড়-চরিত্রের মধ্যে গিরিশচন্দ্রের নিজের ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছে।

ঈশ্বরতত্ত্ব

"কালাপাহাড়—মহাশয়, ঈশ্বর আছেন?

চিন্তামণি—খুব আছে, সত্যি আছে, তিন সত্যি আছে, আর কিছু আছে কি-না জানি না।

কালাপাহাড়—কোথায় ঈশ্বর?

চিন্তামণি—(সম্মুখে একটি তেঁতুল গাছ দেখাইয়া) ঐ তেঁতুল গাছে।

কালাপাহাড়—এ পাগল নাকি?

চিন্তামণি—কেন, পছন্দ হলো না? আচ্ছা, ভাল করে বলছি, তোমার কাছে, অন্তরে অন্তরে সর্ব্বত্র। এই যে, ঐ যে। হৃদয়েশ্বর এই যে আমার হৃদয়ে।

কালাপাহাড়—কই, কোথায় ঈশ্বর?

চিন্তামণি—ওঃ তাই তুমি বেজার হ'য়েছ, না? তুমি ডেকেছ আর কেন ধেয়ে আসেনি; শোন, আমার কথা বিশ্বাস কর—তুমি যেমন ডেকেছ, অমনি এসেছে, তুমি চিন্তে পারনি।

কালাপাহাড়—তুমি দেখেছ, তুমি চিনেছ?

চিন্তামণি—হ্যাঁ, গুরু দেখিয়ে দিয়েছে, আর চিনিনি?

কালাপাহাড়—গুরু কে?

চিন্তামণি—গুরু কে? গুরু লাখ লাখ আছে। চেলা মেলাই মুস্কিল।

কালাপাহাড়—আচ্ছা, বলতে পারো শাস্ত্র কি সত্য?

চিন্তামণি—সব সত্য, সব সত্য, সব সত্য—গুরুর কৃপায় সব বোঝা যায়।

কালাপাহাড়—মহাশয়, গুরু—কেমন তিনি?

চিন্তামণি—ঘটক হে, ঘটক, জুটিয়ে দেয়।

কালাপাহাড়—কি বুঝব? সকলই অন্ধকার!

চিন্তামণি—তা তো সত্য, গুরু না আলো জ্বেলে দিলে কি করে দেখবে?

ক্ষুদ্র নর ক্ষুদ্র জ্ঞানে বুঝিবে কেমনে
উপদেশ বিনে, তত্ত্ব কিবা স্বর্গ মর্ত্ত্য
রসাতলে—বুদ্ধিবলে নির্ণয় না হয়,
সংশয়, সংশয়—মন পরাজয়—ক্লান্ত
অশান্ত কল্পনা, ভ্রমে ব্যাকুল বাসনা,
ক্ষিপ্তপ্রায় মত্তচিত্ত ধায়, নিরুপায়—
দৃষ্টি নাহি চলে মোহ-ঘোর-আবরণে।
গুরুপদ সার, অন্য নাহি আর; তারে
দুস্তর পাথারে নরে গুরু বিনা কেবা?
কর গুরু পদাশ্রয়, নিশ্চয় সংশয়
যাবে দূরে; ভবপারে গুরু কর্ণধার
ঈশ্বর বিরাজমান নর-কলেবরে।

কালাপাহাড়—হায়, অন্ধবিশ্বাস আশ্রয়, যুক্তিশূন্য,
অনুমান! যাহে বিশ্বব্যাপী কহে, নর-
কলেবরে বিরাজিত মানিব কেমনে?
গুরু, গুরু, কেবা গুরু, কোথায়, কোথায়?

কি প্রত্যয় কথায় তাঁহার? মম সম
ক্ষুদ্র নর, আবদ্ধ এ দেহের পিঞ্জরে,
জন্ম-মৃত্যু-মাঝে, দুঃখে সুখে দোলে কয়
দিন, ক্ষীণ তনু পলে পলে, জীবনের
তাপে হবে লীন, ভবে চিহ্নমাত্র নাহি
রবে, আর সীমাশূন্য বিস্তার, বিস্তার,
বিপুল সংসার——লক্ষ্যশূন্য পন্থাহারা
কাহারে বিশ্বাস? চিন্তা, চিন্তা——অহো, রুদ্ধ
হয় শ্বাস, ঘোর ত্রাস, বিনাশ সম্মুখে।

চিন্তামণি——ক্ষুদ্র নর তোমা সম গুরু! গুরু কল্প-
তরু ভবে, ভীরু জনে অভয়-প্রদানে
আবির্ভাব ধরামাঝে, দীন নর-সাজে
সমাজে বিরাজে, নামে হৃদি-তন্ত্রী বাজে,
চরণ-রাজীব-রাজে লইলে স্মরণ,
মোহের বন্ধন খোলে, সুখ দুখ ভোলে,
তমো-বিনাশন ভাতে নবীন নয়ন!
গুরু-কৃপা যার, তার কিবা অগোচর?
গুরুর কৃপায়, অনায়াসে ইষ্টবস্তু
পায়, পূর্ণ হয় আশ, দূরে যায় ত্রাস,
অবিশ্বাস-তমো-নাশ জ্ঞানের প্রভায়।"

শ্রীশ্রীঠাকুর রামকৃষ্ণদেব এক সময় বলিয়াছিলেন——নরলীলায় অবতারকে ঠিক মানুষের মত আচরণ করতে হয়——তাই চিন্তে পারা কঠিন। মানুষ হ'য়েছেন তো ঠিক মানুষ। সেই ক্ষুধা, তৃষ্ণা, রোগ, শোক, কখনও বা ভয় ঠিক মানুষের মত।

'পঞ্চভূতের ফাঁদে ব্রহ্ম প'ড়ে কাঁদে।'

পুরাণে উল্লিখিত আছে যে, পরম ব্রহ্ম শ্রীরামচন্দ্রকে অবতাররূপে চিনিতে পারিয়াছিলেন মাত্র দ্বাদশজন ঋষি। বাকি লোকেরা রামচন্দ্রকে মহাবলশালী, রঘুবংশ-বীর, অযোধ্যার রাজা দশরথের তনয় বলিয়াই জানিতেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধেও ঐরূপ ধারণা সমসাময়িক লোকেরা করিয়াছিল। পাণ্ডবেরা তাঁহাকে সাক্ষাৎ ভগবান্ জানিয়াও তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিলেন।

গিরিশচন্দ্রের তার্কিক মন ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে এবং বর্ত্তমানকালের বিশ্বাস ও শ্রদ্ধাহীনতার জন্য কালাপাহাড়ের ন্যায় অনেক সময় সংশয়ে চিন্তাকুল থাকিত। সেইজন্য বার বার উপদিষ্ট হইলেও মনের চাঞ্চল্য দূর করিতে পারেন নাই। শাস্ত্রবাক্য যে অভ্রান্ত, অপ্রমাদী ঋষিরা যে শাশ্বত সত্য প্রচার করিয়াছেন, ইহা বিশ্বাস করিতে আজকাল অনেকেই পশ্চাদ্‌পদ। গিরিশচন্দ্র সেই অনেকের মধ্যে একজন। তবে তিনি কোন বিষয়ই উপেক্ষা করেন নাই। সর্ব্বদা চেষ্টায় থাকিতেন, কিসে প্রকৃত সত্য লাভ করিবেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের কৃপায় ও তাঁহার ব্যক্তিত্বের প্রভাবে গিরিশচন্দ্রের মনে বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার আসন দৃঢ় হইল। নরেন্দ্রনাথের মত ইংরাজী শিক্ষিত তার্কিককে মাত্র শ্রীরামকৃষ্ণদেবই বলিয়াছিলেন,—"আমি তো ভগবান্‌কে দেখেছি নরেন, তোমাকেও দেখাতে পারি।" সেইদিন হইতে নরেন্দ্রনাথ গুরুপদে আত্মসমর্পণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে থাকেন এবং উত্তরকালে একদিন বলেন—"মহাশয়, আপনার সঙ্গে আর তর্ক করব না। আজ থেকে আপনি যা বলবেন মেনে নেবো—অর্থাৎ অভ্রান্ত সত্য বলে বিশ্বাস করবো।"

গিরিশচন্দ্রেরও সেই অবস্থা হইয়াছিল। তিনি ঠাকুরের প্রতিটি কথা অভ্রান্ত সত্য বলিয়া মানিয়া লইয়াছিলেন।

আমরা—সন্দিগ্ধচিত্তরা—সব সময় গুরুবাক্যে পূর্ণ আস্থা স্থাপন করিতে পারি না। খানিকটা মানি, খানিকটা ত্যাগ করি এবং গুরুর আদেশ যাচাই করিয়া লইতে ইচ্ছা করি। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, গিরিশচন্দ্রের মন সংশয়রহিত ছিল না। চিন্তামণি ও কালাপাহাড়ের কথোপকথনের মধ্যে আমরা দেখিতে পাই—

"কালাপাহাড়—যা বল্‌ছো, তোমার কথা যদি সত্য হয় তাহলে ভাল বটে।

চিন্তামণি—ভাল মন্দ কিছু বিচার করে দেখেছ কি? দেখেছো? না, দিন পাঁচ ছয় চক্ষু বুজে বসেছিলে, গোলাম ব্যাটা আসেনি কেন!

কালাপাহাড়—গোলাম কে?

চিন্তামণি—ঐ ঈশ্বর।

কালাপাহাড়—মহাশয়, একথা নিয়ে ব্যঙ্গ করছেন?

চিন্তামণি—ব্যঙ্গ করছে কে? আমি না তুমি?—বল্‌ছ—'ঈশ্বর', আর দুদিন চক্ষু বুজে বসে দেখা পাওনি বলে একেবারে জেনে ফেলেছ,—শাস্ত্র মিথ্যা, ঈশ্বর মিথ্যা। বাবা, বেকুবি হয় বটে, তুমিও বেকুব, আমিও বেকুব। কিন্তু তুমি কিছু চুটিয়ে বেকুবি করলে।

কালাপাহাড়—কি, তোমার মত অন্ধ-বিশ্বাস করতে বল?

চিন্তামণি—দেখ, এত রুখো না, একটু ঠাণ্ডা হও। একবার স্থির হ'য়ে তোমার বেকুবিটা বোঝ। আমায় বল্‌ছো অন্ধ-বিশ্বাস, আমি আলোর মাঝখানে ব'সে আছি, আর চোখওয়ালা অবিশ্বাস নিয়ে তুমি ভূতের মত অন্ধকারে ঘুরছো। আমার অন্ধ-বিশ্বাসে আমি জগৎ পরিপূর্ণ দেখছি, চোখওয়ালা অবিশ্বাস নিয়ে তুমি হাঁপিয়ে মর্‌ছ।

কালাপাহাড়—যুক্তিহীন কথায় যার প্রত্যয় হ'তে হয় হোক্। আমি কখনও প্রত্যয় করব না।"

ইহা হইতে বুঝা যায় যে, কালাপাহাড়রূপী গিরিশচন্দ্র যুক্তিহীন তর্ক শুনিতে রাজী নন, অন্ধ-বিশ্বাস করিতেও রাজী নন। অর্থাৎ সর্ব্ববিষয়ে চাক্ষুষ প্রমাণ চান, তবে তিনি বিশ্বাস করিবেন। বস্তুতঃ প্রকৃত ভক্তের সিদ্ধান্ত প্রকৃত জ্ঞানের উপরই প্রতিষ্ঠিত, তাহা অন্ধ-বিশ্বাস নহে।

পরমহংসদেবের সংস্পর্শে আসিয়া গিরিশচন্দ্র নানা তর্ক-বিতর্ক উত্থাপন করিয়া এবং নিজ চরিত্রের সম্যক্ পরিচয় দিয়া অবশেষে যে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন, তাহা সকলেই জানেন। শ্রীগুরুর কৃপা পাইয়াছিলেন বলিয়াই গিরিশচন্দ্র ধীরে ধীরে লোকমান্য ও জনসাধারণের আদরণীয় হইয়াছিলেন। গিরিশচন্দ্র যে নাস্তিক ছিলেন, তাহা নহে। নিজের পারিবারিক ও নিজ জাতির সামাজিক ব্যবস্থার অনুসরণ করিয়া চলায় তিনি সাধারণভাবে ঈশ্বর-বিশ্বাসী ও ভক্ত বলিয়াই পরিচিত ছিলেন। কিন্তু কাল-মাহাত্ম্যে ও তৎকালীন সামাজিক শিক্ষা-দীক্ষার প্রভাবে তাঁহার মন তর্কসঙ্কুল ছিল—যেমন সম-সাময়িক শিক্ষিত সাধারণের মধ্যে অনেকেরই ছিল। এমন কি, আচার্য্য বিবেকানন্দের মনের অবস্থাও বহুকাল যাবৎ ঐরূপ ছিল। তথাপি তাঁহারা শেষে শ্রীগুরুর পাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করিয়া শ্রীগুরুপ্রদত্ত উপদেশ বিতরণ করিয়া জগতে অশেষ কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন।

এই আত্মসমর্পণের কারণ কি? গিরিশচন্দ্র সম্পর্কে আমরা এখানে এই প্রশ্নের কিছু আলোচনা করিব।

গিরিশচন্দ্র ঠাকুরের নিকট কয়েকবার আসা-যাওয়ার পর একদিন ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করেন—"এখন থেকে আমি কি করব?" *

শ্রীরামকৃষ্ণ—"যা করছ তাই করে যাও। এখন এদিক্ (ভগবান্) ওদিক্ (সংসার) দুদিক্ রেখে চলো, তারপর যখন একদিক্ ভাঙ্‌বে, তখন যা হয় হবে।

* এই বিষয়টি আমরা স্বামী সারদানন্দ-রচিত "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ" নামক গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ড গুরুভাব—পূর্ব্বার্দ্ধ হইতে অবিকল উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

তবে সকালে বিকালে তাঁর স্মরণ-মননটা রেখো"—এই বলিয়া গিরিশের দিকে চাহিলেন, যেন তাঁহার উত্তরের প্রতীক্ষা করিতেছেন।

গিরিশ শুনিয়া বিষণ্ণ মনে ভাবিতে লাগিলেন—'আমার যে কাজ তাহাতে স্নান-আহার-নিদ্রা প্রভৃতি নিত্য কর্ম্মেরই একটা নিয়মিত সময় রাখিতে পারি না। সকালে-বিকালে স্মরণ-মনন করিতে নিশ্চয়ই ভুলিয়া যাইব। তাহা হইলে তো মুস্কিল, শ্রীগুরুর আজ্ঞা লঙ্ঘনে মহাদোষ ও অনিষ্ট হইবে। অতএব, এ কথা কি করিয়া স্বীকার করি? সংসারে অন্য কাহারও কাছে কথা দিয়াই সে কথা না রাখিতে পারিলে দোষ হয়, তা যাহাকে পরকালের নেতা বলিয়া গ্রহণ করিতেছি, তাঁহার কাছে—।' গিরিশচন্দ্র মনের কথাগুলি বলিতেও কুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন। আবার ভাবিলেন—'কিন্তু ঠাকুর আমাকে তো আর কোন একটা বিশেষ কঠিন কাজ করিতে বলেন নাই। অপরকে একথা বলিলে এখনি আনন্দের সহিত স্বীকার পাইত।' কিন্তু তিনি কি করিবেন, আপনার একান্ত বহির্মুখ অবস্থা ঠিক ঠিক দেখিতে পাইয়াই বুঝিতেছিলেন যে, ধর্ম্মকর্ম্মের অতটুকুও প্রতিদিন করা যেন তাঁহার সামর্থ্যের অতীত। আবার নিজের স্বভাবের দিকে চাহিয়া দেখিতে পাইলেন—'কোনরূপ ব্রত বা নিয়মে চিরকালের নিমিত্ত আবদ্ধ হইলাম'—একথা মনে করিতে গেলেও যেন হাঁপাইয়া উঠেন এবং যতক্ষণ না ঐ নিয়ম ভঙ্গ হয়, ততক্ষণ যেন প্রাণে অশান্তি। আজীবন এইরূপই ঘটিয়া আসিয়াছে। নিজের ইচ্ছায় ভাল মন্দ যাহা হয় করিতে কোন গোল নাই। কিন্তু যেমন মনে হইল বাধ্য হইয়া অমুক কাজটা আমায় করিতে হইতেছে বা হইবে, অমনি মন বাঁকিয়া দাঁড়াইল। কাজেই আপনার নিতান্ত অপারক ও অসহায় অবস্থা উপলব্ধি করিতে করিতে কাতর হইয়া চুপ করিয়া রহিলেন,—'করিব' বা 'করিতে পারিব না' কোন কথাই বলিতে পারিলেন না। আর অত সোজা কাজটা করিতে পারিবেন না, একথা লজ্জার মাথা খাইয়া বলেনই বা কিরূপে—বলিলেও ঠাকুর ও উপস্থিত সকলেই বা কি মনে করিবেন? তাঁহার একান্ত অসহায় অবস্থার কথা হয়তো বুঝিতেই পারিবেন না, আর মুখ ফুটিয়া না বলিলেও মনে নিশ্চয় করিবেন তিনি একটা ঢঙ্ করিয়া কথাগুলি বলিতেছেন।

ঠাকুর গিরিশকে ঐরূপ নীরব দেখিয়া তাঁহার দিকে চাহিলেন এবং তাঁহার মনোগত ভাব বুঝিয়া বলিলেন—"আচ্ছা তা যদি না পার তো খাবার-শোবার আগে তাঁর একবার স্মরণ করে নিও।"

গিরিশ নীরব। ভাবিলেন, উহাই কি করিতে পারিবেন! দেখিলেন—কোন দিন খান বেলা দশটায়, আর কোন দিন বৈকালে পাঁচটায়; রাত্রির

খাওয়া সম্বন্ধেও ঐ নিয়ম। আবার মামলা-মোকদ্দমার ফ্যাঁসাদে পড়িয়া এমন দিন গিয়াছে যে, খাইতে বসিয়াছেন বলিয়াই হুঁস্ নাই। কেবলই উদ্বিগ্নচিত্তে ভাবিতেছেন—'ব্যারিষ্টারকে যে ফি পাঠাইয়াছি তাহা ঠিক সময়ে তাঁহার হাতে পেঁৗছিল কি-না, খবরটা পাইলাম না, মোকদ্দমার সময় যদি তিনি উপস্থিত না হন, তাহা হইলেই তো বিপদ', ইত্যাদি। কার্য্যগতিকে ঐরূপ দিন যদি আবার আসে, আর আসাও কিছু অসম্ভব নয়,—তাহা হইলে সে দিন ভগবানের স্মরণ-মনন করিতে তো নিশ্চয় ভুলিবেন! হায়, হায়, ঠাকুর এত সোজা কাজ করিতে বলিতেছেন, আর তিনি 'করিব' বলিতে পারিতেছেন না। গিরিশ বিষম ফাঁপরে পড়িয়া স্থির, নীরব রহিলেন, আর তাঁহার প্রাণের ভিতরে যেন একটা চিন্তা, ভয় ও নৈরাশ্যের ঝড় বহিতে লাগিল। ঠাকুর গিরিশের দিকে আবার চাহিয়া হাসিতে হাসিতে এইবার বলিলেন—"তুই বল্‌বি, 'তাও যদি না পারি',—আচ্ছা তবে আমায় বকল্‌মা দে।" ঠাকুরের তখন অর্দ্ধ বাহ্যদশা। এই কথা শুনিয়া ও শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাব দেখিয়া গিরিশচন্দ্রের মন কতকটা আশ্বস্ত হইল। তাঁহার মনে হইল 'যাক্ বাঁচা গেল, নিয়ম-কানুনের মধ্যে আর বদ্ধ হয়ে থাকতে হবে না। আমার ভার যখন ঠাকুর নিয়েছেন, তখন আমায় প্রত্যেক কাজের জন্য তিনিই জবাবদিহি করবেন, ভাল কাজই করি আর মন্দ কাজই করি।' শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহাকে 'আমি কাজ করছি' এমন কথা বলিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। বলিতে শিখাইয়াছিলেন—'তাঁর ইচ্ছাতেই করছি।' কিন্তু আর একদিকে এক মুস্কিল আসিল। নিয়ম-কানুনের বন্ধনের বালাই রহিল না বটে, কিন্তু 'ত্রাতার ভালবাসার প্রেমে বদ্ধ হলুম'—এই কথা গিরিশ ভাবিতে লাগিলেন। 'তাঁকে ছেড়ে কোন কাজ করবার যো নেই। এখন বুঝলুম বকল্‌মা দেওয়া সহজ ব্যাপার নয়। তাঁর পক্ষে নেওয়াটা সহজ হলেও আমার পক্ষে দেওয়াটা সোজা নয়'—এই কথা গিরিশচন্দ্র তাঁর গুরু-ভাইদের কাছেও সর্ব্বদা বলিতেন। উত্তরকালে সময় সময় আমরা যখন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতাম তখন কোন কার্য্য আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে তাঁহার মুখে প্রায়ই 'জয় রামকৃষ্ণ' 'জয় রামকৃষ্ণ' শুনিতাম। পুরাণোক্ত সেই বিখ্যাত শ্লোক এখানে স্বতঃই মনে উদিত হয়—

"জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তিঃ।
জানাম্যধর্ম্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ॥
ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন।
যথা নিযুক্তো'স্মি তথা করোমি॥"

গিরিশচন্দ্রের মনের অবস্থাও ঠিক এইরূপ দাঁড়াইল। তিনি সর্ব্বান্তঃকরণে শ্রীরামকৃষ্ণের চরণে আত্মসমর্পণ করিলেন।

ভক্ত গিরিশচন্দ্রই সর্ব্বপ্রথম শ্রীশ্রীঠাকুরকে শ্রীশ্রীজগদম্বার প্রতীকরূপে পূজা করেন। চিকিৎসার জন্য শ্রীশ্রীঠাকুরকে যখন শ্যামপুকুরের গোকুল ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বাটীতে আনিয়া রাখা হইল তখন একদিন এই ঘটনাটি ঘটে—

গিরিশচন্দ্র-কর্ত্তৃক শ্রীশ্রীঠাকুরকে অবতারজ্ঞানে পূজা

দুর্গাপূজার সময়ে যেইরূপ কালীপূজার সময়েও ঠাকুরের ঠিক সেইরূপ ভাবাবেশ হইত। এবার আসন্ন কালীপূজার দু'একদিন পূর্ব্বে ইটালি রামকৃষ্ণ অর্চ্চনালয়ের প্রতিষ্ঠাতা দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার ইচ্ছা করেন, এবার শ্যামপুকুরের বাড়ীতে শ্রীশ্রীঠাকুরের সামনে কালীপূজার আয়োজন করিবেন। কারণ, প্রতিমা আনিয়া দেবীপূজা করিবার সঙ্কল্প তাঁহার পূর্ব্ব হইতেই ছিল। কিন্তু ভক্তগণের অনেকেই বলিলেন যে, এইরূপ পূজা হইলে উত্তেজনায় ঠাকুরের স্বাস্থ্য মন্দের দিকে যাইতে পারে। দেবেন্দ্রনাথ নিজ সঙ্কল্প ত্যাগ করিলেন। এদিকে ঠাকুর কিন্তু পূজার পূর্ব্ব দিবসে কয়েকজন ভক্তকে বলিলেন—"পূজার উপকরণ সব যোগাড় করে রাখিস্, কাল কালীপূজা করতে হবে।" এই কথা শুনিয়া ভক্তেরা আনন্দিত হইল; কিন্তু পূজা কিভাবে হইবে সে বিষয়ে ঠাকুরের নিকট হইতে কোন নির্দ্দেশ পাইলেন না। পূজাই বা কে করিবে তাহারও কিছু স্থির হইল না। স্থির হইল যে, পূজার উপকরণাদি সমস্ত সংগ্রহ করিয়া রাখা হউক, ঠাকুরের আদেশ মত যাহা হয় পরে করা যাইবে। পূজার দিন রাত্রি আসিয়া পড়িলেও ঠাকুরকে দেখা গেল স্থিরভাবে শয্যায় বসিয়া আছেন। পূজার উপকরণাদি তাঁর পার্শ্বেই রক্ষিত ছিল। দক্ষিণেশ্বরে অবস্থানকালে ঠাকুর কখনও কখনও আপনাকে আপনি পূজা করিতেন। ভক্তরা কেহ কেহ ইহা দেখিয়াছিলেন। আজ হয়তো সেইভাবে নিজ দেহ-মনকে শ্রীজগদম্বার প্রতীক করিয়া পূজা করিতে পারেন—ভক্তরা এইরূপ ভাবিতে লাগিলেন। ধূপ-দীপাদি জ্বলিতে লাগিল; গৃহ নীরব; বহু ভক্তসমাবেশ সত্ত্বেও গৃহ নীরব; ঠাকুর তখনও নিশ্চিন্তে বসিয়া আছেন। মহেন্দ্রনাথ (শ্রীম), রামচন্দ্র (দত্ত), দেবেন্দ্রনাথ, গিরিশচন্দ্র প্রভৃতি প্রবীণ ব্যক্তিগণ যুবক ভক্তগণের সহিত ঐ ঘরে বসিয়া আছেন। সকলেই ঠাকুরের মুখে শুনিয়াছেন 'গিরিশচন্দ্রের পাঁচসিকে পাঁচ আনা বিশ্বাস।' অনেকে চঞ্চল হইলেও গিরিশচন্দ্র নিশ্চিন্ত। গিরিশচন্দ্র ভাবিলেন, নিজের জন্য পূজা করার

আবশ্যকতা তাঁর কি আছে? তবে কি ভক্তগণের জন্য তাঁহার জীবন্ত প্রতিমায় পূজা গ্রহণ করিয়া তাঁহাদের ধন্য করিবেন? নিশ্চয় তাহাই—এই ধারণা করিয়া উল্লাসে অধীর হইয়া সম্মুখস্থ পূজোপচার অঞ্জলিতে গ্রহণ করিয়া 'জয়মা, জয়মা', বলিয়া ঠাকুরের পাদপদ্মে অঞ্জলি প্রদান করিলেন। ঠাকুর তৎক্ষণাৎ সমাধিমগ্ন হইলেন। মুখমণ্ডল জ্যোতির্ম্ময় এবং দিব্য হাস্যে বিকশিত; হস্তদ্বয়ে বরাভয় মুদ্রা ঈশ্বরী জগদম্বার আবেশের পরিচয় প্রদান করিল। তখন ভক্তগণ নানা চিন্তা করিয়াও শেষে গিরিশের ন্যায় মহোল্লাসে শ্রীশ্রীঠাকুরের পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি দিতে লাগিলেন।

ঠাকুরের প্রতি গিরিশচন্দ্র অনেক সময় অনেক কটূক্তি করিয়াছেন, কিন্তু কটূক্তি শুনিয়াও ঠাকুর চঞ্চল হন নাই। বরং তিনি গিরিশচন্দ্রের প্রতি অনুরাগী ছিলেন। তিনি অনেক সময় বলিতেন—''আসবাদি পান, কটুকাটব্য শব্দ উচচারণ, মন্দসঙ্গ—এই সব গিরিশকে অবনত করতে পারবে না। সে ভৈরবের অংশে জন্মগ্রহণ করেছে, ওগুলোতে তার কিছু এসে যাবে না।''

গিরিশচন্দ্রের প্রতি ঠাকুরের স্নেহ প্রদর্শন

শ্রীরামকৃষ্ণদেব একদিন থিয়েটার দেখিতে আসিয়াছেন। গিরিশচন্দ্র গরম গরম লুচি আনাইয়া পরমহংসদেবের আহারের ব্যবস্থা করিলেন। কারণ, অভিনয় দর্শনান্তে দক্ষিণেশ্বরে গিয়া আহার করিতে হইলে রাত্রি অধিক হইবে। অভিনয় শেষে যখন পরমহংসদেব যাত্রার উদ্যোগ করিতেছেন, তখন প্রমত্ত অবস্থায় গিরিশচন্দ্র আসিয়া ঠাকুরকে বলিলেন—''তুমি আমার ছেলে হও।'' ঠাকুর বলিলেন—''তা কেন? আমি তোর ইষ্ট হ'য়ে থাক্‌বো।'' গিরিশচন্দ্র বার বার ঐরূপ আবদার করিলেও ঠাকুরের ঐ এক কথা—''তোর ইষ্ট হ'য়ে থাক্‌বো। আমার বাপ অতি নির্ম্মল ছিলেন। আমি তোর ছেলে কেন হব?''

শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত গিরিশের সম্বন্ধ

মত্ততাপ্রযুক্ত গিরিশচন্দ্র অকথ্য ভাষায় ঠাকুরকে গালি দিতে লাগিলেন। ভক্তগণ কুপিত হইয়া গিরিশচন্দ্রকে শাস্তি দিতে উদ্যত। ঠাকুর তাহাদিগকে নিরস্ত করিবার জন্য হাসিতে হাসিতে বলিলেন—''এটা কোন্ থাকের ভক্ত রে? এটা বলে কি?'' গিরিশচন্দ্র আপন মনে গালি দিয়া চলিল। ঠাকুর যখন গাড়ীতে উঠিয়া দক্ষিণেশ্বরে যাত্রা করিতেছেন, ঠিক সেই সময় গিরিশচন্দ্র ছুটিয়া আসিয়া কর্দ্দমাক্ত রাস্তার উপর সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন। ঠাকুরের গাড়ী চলিয়া গেল।

পরদিন ঠাকুরের ভক্তগণ দক্ষিণেশ্বরে মিলিত হইয়া গিরিশচন্দ্রের সহিত ঠাকুরকে মিশিতে নিষেধ করিতে লাগিলেন। সেই সময় ঠাকুরের পরমভক্ত রামচন্দ্র দত্ত আসিয়া উপস্থিত। তাহাকে দেখিয়া ঠাকুর বলিলেন—"শুনেছো গা রাম, দেড়খানা লুচি খাইয়ে গিরিশ আমার মাতৃচ্ছন্ন পিতৃচ্ছন্ন করেছে।"

ভক্তগণ-কর্তৃক শ্রীশ্রীঠাকুরকে গিরিশচন্দ্রের সহিত মিশিতে নিষেধ

রামবাবু বলিলেন—"কি করবেন? সে তো ভালই করেছে।"

পরমহংসদেব বলিলেন—"শোন, শোন, রাম কি বলে,—এর পর যদি আমায় মারে?"

রাম—"মার খেতে হবে। গিরিশের অপরাধ কি? কালীয়সর্পের বিষে রাখাল বালকদের মৃত্যু হলে কৃষ্ণ যথাবিহিত শাস্তি দেওয়ার জন্য উপস্থিত হ'য়ে বল্লেন—'তুমি কি জন্য বিষ উদ্‌গীরণ কর?' কালীয় তাতে উত্তর করে,—'আমাকে আপনি যা দিয়েছেন তাই উদ্‌গীরণ করেছি।' গিরিশকে আপনি যা দিয়েছেন সে তাই দিয়ে আপনার পূজা করেছে। আপনি পতিতপাবন নিজে অঞ্জলি পেতে সেই বিষ নিয়ে এসেছেন।"

পরমহংসদেব তৎক্ষণাৎ রামকে বলিলেন—"রাম, তবে গাড়ী আন। আমি গিরিশ ঘোষের বাড়ী যাব।" কেহ কেহ আপত্তি করিলেও তিনি গিরিশের বাড়ী রওনা হইলেন।

এদিকে গিরিশচন্দ্র নিশ্চিন্ত মনে আছেন। বন্ধুরা বলিতে লাগিল তাহার গুরুতর অপরাধ হইয়াছে। গিরিশচন্দ্র বলিলেন—"অপরাধ কটা সামলাইব? তিনি যদি আমার অপরাধ ধরেন তবে আমি রেণুর রেণু হইয়া যাই।" কিন্তু ঠাকুরের ভক্তগণের মনে ব্যথা দিয়েছেন বলিয়া তিনি বিশেষ অনুতপ্ত হইয়াছিলেন।

এমন সময় ঠাকুর ভক্তগণসহ উপস্থিত হইয়া বলিলেন—"ঈশ্বরের ইচ্ছায় এলুম।" ঐ সময় নরেন্দ্রনাথ গিরিশচন্দ্রের পদধূলি লইয়া বলিলেন—"ধন্য তোমার বিশ্বাসভক্তি।" ভক্তগণ গিরিশচন্দ্রের সহিত মিশিতে নিষেধ করায় শ্রীশ্রীঠাকুর আর এক সময় বলিয়াছিলেন—"তোমরা গিরিশের যে সব দোষের কথা বল্‌ছো, ও সবে গিরিশের কিছুই হবে না। গিরিশের ভৈরবের অংশে জন্ম—ও দেবকন্যাও লিবে—রাবণকেও লিবে—আবার রামকেও লিবে।"

নরেন্দ্রনাথ-কর্তৃক গিরিশচন্দ্রের পদধূলি গ্রহণ

গুরু সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা প্রসঙ্গে একদিন ঠাকুর গিরিশচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন—"গুরু ইষ্টকে দেখাইয়া দেন।" ঐ কথা শুনিয়া গুরুগত প্রাণ গিরিশ জিজ্ঞাসা করেন—'গুরু তখন কোথায় যান?' ঠাকুর—'গুরু ইষ্টে মিলিত হন।' ঠাকুরের এই কথা শুনিয়া গিরিশ শান্ত হন। তিনি যেন এক বিরাট সমস্যার মীমাংসা খুঁজিয়া পাইলেন।

গিরিশচন্দ্রের প্রতি শ্রীশ্রীঠাকুরের স্নেহ, পায়স ও কচুরি প্রদান

দক্ষিণেশ্বরে অবস্থানকালে শ্রীশ্রীঠাকুর পায়সের বাটি লইয়া একদিন গিরিশচন্দ্রকে প্রসাদ হিসাবে খাওয়াইয়াছিলেন এবং কাশীপুরের উদ্যানে মহা-সমাধিক্ষেত্রে, নিত্য আবির্ভাব তীর্থে একদিন গিরিশচন্দ্র কচুরি খাইতে ভালবাসেন বলিয়া ঠাকুর যুবক সেবকদের আদেশ করেন—"দোকান থেকে গিরিশের জন্য কিছু কচুরি নিয়ে আয়।" কচুরি আনা হইলে তিনি ঠোঙাটা দেখিয়া বলিলেন—"ওরে, ঠিক্ ঠিক্ এনেছিস্? ফাউ কই? এতগুলো কচুরি কিন্‌লে খানিকটা ফাউ দেয় যে রে। কোন জিনিষ কিন্‌তে গেলে ঠক্‌বি নি ঠকাবি নি।" গিরিশচন্দ্র এদিকে কচুরিগুলি খাইতে লাগিলেন। ভক্ত সেবকগণ তখন বাহিরে বেড়াইতেছেন। কিন্তু কোন পাত্রে জল দেওয়া হয় নাই বলিয়া ঠাকুর বলিলেন—"ছোঁড়াদের আক্কেল দেখলে? খাবার দিয়ে গেছে, জল দেয়নি।" নিজে বিছানায় কাৎ হইয়া জলপাত্র হইতে গেলাসে করিয়া গিরিশকে জল দিলেন। গিরিশের প্রতি এই অপার করুণা দেখিয়া যুবক ভক্তগণ বিস্মিত হইয়া গেলেন।

গিরিশচন্দ্রের প্রতি ঠাকুরের বাৎসল্য

গিরিশচন্দ্রের আত্মনিন্দা ও স্বরূপ প্রকাশ করিবার পর ঠাকুর তাঁহাকে যাহা বুঝাইয়াছিলেন তাহা ইতঃপূর্ব্বে বলা হইয়াছে। আর এক সময় 'আমার কি হবে' এইরূপ প্রশ্ন করায় ঠাকুর বলিয়াছিলেন—"গিরিশ, তুমি আমার ছিপ্‌ভাঙ্গা ছেলে।" গল্পটি এই: ঠাকুর বলিলেন—"এক বড়লোক, জমিদারের দুটি ছেলে ছিল—বড়টি বিদ্বান্, পণ্ডিত, পাশ করা, বাপের অনুগত—বাপের কাজে সব সময় সাহায্য করত। আর ছোট ছেলেটি কিছু লেখাপড়া শেখেনি, সর্ব্বদাই গীত-বাদ্য-যাত্রা-থিয়েটার এই সব নিয়েই মত্ত—ঢোল বাজিয়ে, তবলা বাজিয়ে বেড়াত; বাড়ীর সঙ্গে সম্পর্ক খাবার সময় দু'বার আর গভীর রাত্রে শোবার সময়। মায়ের সঙ্গে দেখা হয় খাবার সময়, কিন্তু বাপের কাছে কখনও ঘেঁষে না। একদিন কর্ত্তা গৃহিণীকে জিজ্ঞাসা করলেন—'ছোট্‌কা কোথায়? সে আমার কাছে আসে না কেন?'

তাতে গৃহিণী উত্তর করেন—'জান তো সে লেখাপড়া শেখেনি, মুখ্যু, তোমার কাছে আসতে ভয় পায়।' কর্ত্তা বললেন—'আচ্ছা, তাকে তুমি আমার সঙ্গে দেখা কর্‌তে বোলো, আমি তাকে কিছু বলব না।' একদিন মা ছোটছেলেকে বললেন—'তোমার বাবা তোমাকে দেখতে চেয়েছেন। তার সঙ্গে তোমাকে দেখা কর্‌তে হবে। তিনি বলেছেন, তোমাকে তিনি বক্‌বেন না।' ছোটছেলে প্রথমে ভয়ে স্বীকার করেনি। শেষে মায়ের উপদেশে একদিন রাজী হয়ে মায়ের পিছনে পিছনে গেল।

কর্ত্তা গৃহিণীকে জিজ্ঞাসা করলেন—'কই, তোমার ছোটছেলে কই এল না?' গৃহিণী বললেন—'সে এসেছে, ভয়ে তোমার সামনে আসতে পারছে না, আমার পেছনে দাঁড়িয়ে আছে।' কর্ত্তা তা শুনে বললেন—'ওরে ছোটকা, এদিকে আয়। তুই তো এদিক্ ওদিক্ খালি ঘুরে বেড়াস্, আজকে বাগানে যাবি?'

ছোটকা তো হাতে আকাশ পেল, বললে—'হ্যাঁ, বাবা বাগানে যেতে পারি।' কর্ত্তা তখন বড়ছেলেকে ডেকে বাগানে যাবার বন্দোবস্ত কর্‌তে বললেন। সব বন্দোবস্ত হোলো। কর্ত্তা দুই ছেলেকে নিয়ে গাড়ী করে চলে গেলেন বাগানে। বাগানে গিয়ে বড় ছেলে বাপের সঙ্গে সঙ্গে কোন্ গাছে কি ফল হয়েছে, কোন্ কলমের গাছটা উঠ্‌ছে, কোথায় শাকসব্জী হচ্ছে—বাপকে সঙ্গে নিয়ে সব দেখাচ্ছে আর বোঝাচ্ছে। এদিকে ছোটছেলের খোঁজ নেই। সে মালীর ঘরে গিয়ে বড় একগাছা ছিপ্ নিয়ে মালীকে দিয়ে চারের যোগাড় করে একটা পুকুরে মাছ ধরতে বসে গেছে। বেলা যখন চারটে বাজে তখন বাপ জিজ্ঞাসা কর্‌লে—'ছোটকা কোথায় গেল?' বড় ছেলে বললে—'বোধ হয়, সে মাছ ধরতে গেছে।' বাপ বললেন—'তাকে ডেকে নিয়ে এসো। জলখাবার এনেছে, তোমরা দু'ভায়ে খাও, আমাকেও দাও।' বড় ছেলে ছোট ভাইকে ডাকতে গেল। ছোট ছেলে দাদাকে বললে—'দাদা, মাপ কর, এই ছিপে দু'একটা মাছ ধরে তারপর যাচ্ছি।' বড় ছেলে কর্ত্তাকে গিয়ে সে কথা বলাতে বাপ বললেন—'ছোঁড়া যেখানে যাবে সেখানেই জ্বালাবে।' রাগ করে কর্ত্তা নিজে গিয়ে ছোট ছেলের হাত থেকে ছিপ্ কেড়ে নিয়ে ভেঙ্গে টুক্‌রো টুক্‌রো করে দিলেন, তারপর ছোট ছেলের হাত ধরে টেনে নিয়ে জলখাবার খাইয়ে দু'জনকে নিয়ে গাড়ী করে বাড়ী ফিরে এলেন। ছোট ছেলে দুষ্টু বলে কি তাকে ফেলে রেখে চলে যাবেন?" ঠাকুর বলিলেন—"গিরিশ, তুই আমার ছোট ছেলে আর নরেন আমার বড় ছেলে। বাড়ী যাবার সময় গাড়ী করে তোকে ও নরেনকে নিয়ে একসঙ্গে চলে যাবো। তুই আমার ছিপ্‌ভাঙ্গা ছেলে।"

কাশীপুর উদ্যানবাটীতে থাকাকালীন ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী, ঠাকুর অপেক্ষাকৃত সুস্থ বোধ করিলে অপরাহ্নে দ্বিতল হইতে নীচে নামিয়া বাগানে একটু বেড়াইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। নীচের ঘরে নামিয়া আসিলে তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া কয়েকজন গৃহি-ভক্ত দূর হইতে আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিতে লাগিল। পরে দক্ষিণ-পশ্চিমের রাস্তা ধরিয়া যখন তিনি অগ্রসর হইতে লাগিলেন, তখন ঠাকুর দেখিলেন প্রায় ৩০জন ভক্ত দলে দলে বিভক্ত হইয়া গাছের তলায় আশ্রয় লইয়া বসিয়া আছেন। ছুটির দিন বলিয়া বহু ভক্ত ও অনুরাগী জন ঐ দিন তথায় সমবেত হন। কিছুদূর অগ্রসর হইয়া দেখিলেন গিরিশ, রাম, অতুল (গিরিশচন্দ্রের ভ্রাতা) প্রভৃতি কয়েকজন এক বৃক্ষতলে বসিয়া আছেন। ঠাকুরকে দেখিতে পাইয়া তাঁহারা তাঁহাকে প্রণাম করিয়া নিকটে আসিলেন। এই সময় একটি ঘটনা ঘটিল:

'ঠাকুর কল্পতরু'

অকস্মাৎ ঠাকুর গিরিশচন্দ্রকে বলিলেন—"তুমি যে এতকথা সকলকে বলে বেড়াও, তুমি কি দেখেছ, কি বুঝেছ?" অর্থাৎ গিরিশচন্দ্র যে ঠাকুরকে অবতার বলিয়া প্রচার করেন, তাঁর অবতারত্বের কি প্রমাণ সে পাইয়াছে? গিরিশচন্দ্র তৎক্ষণাৎ বিচলিত না হইয়া তাঁহার পদপ্রান্তে হাঁটু গাড়িয়া বসিলেন ও বলিয়া উঠিলেন—"ব্যাস-বাল্মীকি যাঁর ইয়ত্তা কর্‌তে পারেন নি, আমি তাঁর সম্বন্ধে বেশী আর কি বলতে পারি?" গিরিশের প্রত্যেক কথায় তাঁহার অন্তরের সরল বিশ্বাসের পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে (গিরিশচন্দ্রকে) উপলক্ষ্য করিয়া সমবেত ভক্তগণকে ঠাকুর বলিলেন—"তোমাদের কি আর বল্‌বো। আশীর্ব্বাদ করি, তোমাদের চৈতন্য হোক্।" ঠাকুরের এই কল্পতরুর ন্যায় সমবেত ভক্তগণকে আশীর্ব্বাদ করার দিনটিকে উপলক্ষ্য করিয়া নানা আশ্রমে ও মঠে প্রতি ১লা জানুয়ারীতে 'কল্পতরু' উৎসব হইয়া থাকে। এ ক্ষেত্রেও দেখা গেল গিরিশচন্দ্রকে লইয়াই এই 'কল্পতরু' উৎসবের উদ্ভব।

গিরিশচন্দ্র প্রভৃতিকে শ্রীশ্রীঠাকুরের বর দান

ঐ কাশীপুরের বাগানে শ্রীশ্রীঠাকুরের অবস্থানকালে একদিন বরাহ-নগরের শ্রীগোপালচন্দ্র দাস পরে 'বুড়ো গোপাল' এবং রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের স্বামী অদ্বৈতানন্দ ঠাকুরকে দর্শন করিতে আসেন। আলাপের পর শ্রীগোপাল একদিন তাঁহাকে জানাইলেন যে, পর দিবস হয়তো তিনি আসিতে পারিবেন না। ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন—"কেন হে, ব্যাপার কি? কোথায় যেতে হবে?" শ্রীগোপাল বলিলেন—"কাল বড়বাজারে গঙ্গাসাগরের ফেরত সাধুদের সেবায়

যাব। কিছু গৈরিক বস্ত্র ও জলখাবার মিষ্টান্নাদি দিতে হবে।" ঠাকুর উত্তর করিলেন—"তুমি তো সাধুভোজন করাবে এই উদ্দেশ্যে সেখানে যেতে চাইছ?"

গোপাল—"আজ্ঞে, হ্যাঁ।"

ঠাকুর বলিলেন—"এক কাজ কর না, তোমার কাপড়, খাবার না হয় এইখানেই এনো, সাধুভোজন এইখানেই হবে আর সাধুদের কাপড় দেওয়াও এইখানেই হবে?" গোপালচন্দ্র শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ অনুরাগী ভক্ত হইয়াছেন। তিনি তাঁহার কথা ঠেলিতে পারিলেন না। পরদিবস যথাসময়ে শ্রীগোপাল কতকগুলি গৈরিক বস্ত্র ও মিষ্টান্নাদি লইয়া আসিলেন। তখন ঠাকুর নরেন্দ্রাদি ভক্তগণকে দেখাইয়া বলিলেন—"এই ছেলে কটাকে জলযোগ করাও এবং গেরুয়া দাও, এরা খুব বড় রকমের সাধু হবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।"

গিরিশকেও গেরুয়া প্রদান

দশ জনকে দশখানি কাপড় দিবার পর, উপস্থিত ছেলেদের সকলকেই দেওয়া হইল, একখানা কাপড় বাকী থাকে। তখন ঠাকুর গিরিশচন্দ্রকে দেখাইয়া বলিলেন—"ও কাপড়খানা গিরিশকেই দাও এবং জলযোগ করাও, ও বড় কম সাধু নয়।" গিরিশবাবু গেরুয়া পাইয়া মুস্কিলে পড়িলেন। ভাবিলেন—'প্রতিদিন থিয়েটারে যেতে হবে এবং মাঝে মাঝে অভিনয় কর্‌তে হবে গেরুয়া নিয়ে আমি করব কি? তবে ঠাকুরের আদেশ অগ্রাহ্য করবার সাধ্য তো নাই।' এই ভাবিয়া সেই গেরুয়া কাপড়টিকে তৎক্ষণাৎ মাথায় পাগড়ির মত বাঁধিয়া ফেলিলেন। ঠাকুর উহা দেখিয়া বলিলেন—"তোমার ওতেই হবে।"

এইসব ঘটনা হইতেই বিশেষরূপে বুঝা যায় শ্রীশ্রীঠাকুর গিরিশচন্দ্রকে কিরূপ চক্ষে দেখিতেন এবং গিরিশচন্দ্রও ঠাকুরকে কিভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ঠাকুরের আদেশ যেমন করিয়া হউক পালন করিতেই হইবে। গিরিশচন্দ্রের মুখে শুনিয়াছি, তিনি বলিতেন—"সাতপুরুষের কেনাকেলে চাকর কে জানিস্—বিনে মাইনের—ডাকলেই হাজির হয়! তার নাম শোন্—ভগবান্।" ভগবান্‌কে ডাকিলেই পাওয়া যায়, ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমানে যখন যে ডাকিবে তাহাকেই তিনি দেখা দিবেন, এইরূপ বিশ্বাস গিরিশচন্দ্রের মনে প্রবল হইয়াছিল। পূর্ব্বোক্ত বকল্‌মা নেওয়া-দেওয়ার ফলে এইরূপ অবস্থা।

* * * *

পূজ্যপাদ স্বামী সারদানন্দপ্রমুখ কয়েকজন ভক্তের সহিত শ্রীশ্রীমা

গিরিশচন্দ্রের অনুরোধে মিনার্ভা থিয়েটারে 'জনা' নাটকের অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলেন। অভিনয় তাঁহার খুব ভালই লাগিতেছিল। অনেকটা অভিনয় হইবার পর শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দজী শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"মা কেমন অভিনয় দেখ্ছেন?"

মা বলিলেন—"শরৎ, এতো অভিনয় নয়, গিরিশ যে নিজেই বিদূষক, তাই তার অভিনয় অত জীবন্ত।" 'জনা' নাটকের এই বিদূষক-চরিত্র গিরিশচন্দ্রের অন্যতম সৃষ্টি। পরমভক্ত-বিদূষক রাজ-বয়স্যের অন্যতম হিসাবে রহস্যচ্ছলে যে সকল ধর্ম্মোপদেশ দিয়া ভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছিলেন, তাহা অতুলনীয়। বিদূষককে ধীমান্ দর্শক বা পাঠকগণ পরমভক্তরূপেই দেখিয়াছিলেন।

গিরিশচন্দ্রের দেবদেবীর প্রতি ভক্তি কিরূপ সার্থকতা লাভ করিয়াছিল, তাহা তাঁহার উইল হইতে সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারা যায়। তবে উইলে তাঁহাদের নিজ গৃহদেবতা শ্রীধরের সেবাপূজা সম্বন্ধে তাঁহার মনোভাব বিশেষ করিয়া প্রকাশ পাইয়াছে এবং হিন্দুর আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে তিনি কতটা নিষ্ঠাবান্ হইয়াছিলেন, তাহাও ঐ উইলে আছে।

গৃহদেবতা 'শ্রীধরের সেবা'

গিরিশচন্দ্রের বাড়ীর ঠাকুরদালানে বাল্যকাল হইতে আমরা পূজা-অর্চ্চনা কিছু দেখি নাই। প্রৌঢ়ত্বের শেষ সীমায় গিরিশচন্দ্র মহামায়া শ্রীশ্রীদুর্গাদেবীর প্রতিমা আনাইয়া পূজা করিয়াছিলেন এবং ঐ উপলক্ষ্যে মহাসমারোহে জনগণের সেবা করিয়াছিলেন। সেই সময় শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ-জননী শ্রীশ্রীসারদাদেবী মাতা-ঠাকুরাণীকে বলরামবাবুর বাড়ী হইতে আনাইয়া তিন দিনই অশেষ ভক্তির সহিত পূজা-অর্চ্চনা করিয়া শ্রীপদে পুষ্পাঞ্জলি দান করেন। মহাষ্টমীর দিন মধ্যরাত্রের পর সন্ধিপূজার ব্যবস্থা থাকায় শ্রীশ্রীমাকে অত রাত্রে বিরক্ত করিবেন না বলিয়া আনিবার ব্যবস্থা করেন নাই। কিন্তু ঘটনা এইরূপ হইল যে, শ্রীশ্রীমা সন্ধিপূজা আরম্ভ হইবার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে বলরামবাবুদের কাহাকেও সঙ্গে লইয়া গিরিশবাবুর খিড়্কির দরজায় আসিয়া আঘাত করিতে থাকেন এবং বলেন—"আমি এসেছি, দরজা খুলে দাও।" গিরিশচন্দ্র উল্লসিত হইয়া উঠিলেন এবং তাঁহার প্রতি শ্রীশ্রীমাও অত কৃপা করিতেছেন জানিয়া আনন্দাশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন।

'দুর্গাপূজা'

গিরিশচন্দ্রের প্রতি শ্রীশ্রীমায়ের অনুকম্পা

সাক্ষাৎ জগদম্বা জ্ঞানে শ্রীশ্রীমাকে পূজা করিলেও ভক্ত গিরিশচন্দ্র একদিন এই মাকেই জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"তুমি আমাদের কিরকম মা?"

উত্তরে মা বলেন—"আমি তোমাদের সত্যি মা। গুরুমা নই, পাতান মা নই, কথার কথা মা নই—সত্যিকারের মা।"

তারকেশ্বরের প্রতি ভক্তি ও বিশ্বাস

শ্রীশ্রীতারকেশ্বরের বাবা তারকনাথের প্রতি তাঁহার যে গভীর বিশ্বাস ছিল তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। বাড়ীর বিপদ-আপদে তিনি বারবার বাবা তারকনাথের শরণাপন্ন হইতেন। বাবা তারকনাথ নিশ্চয়ই তাঁহার মনোবাসনা অনেক বার পূর্ণ করিয়াছেন, একথা বেশ বোঝা যায়।

আর একটা বিশ্বাসের কথা বলি। একদিন আমাকে গাড়ীতে তুলিয়া লইয়া গিরিশচন্দ্র 'রঙ্গালয়' নামক সাপ্তাহিক পত্রের কার্য্যালয়ে চলিলেন। পথে যাইবার সময় বাগবাজারের শ্রীশ্রীমদনমোহনের মন্দির পার হইয়া শ্রীশ্রী (বড়) সিদ্ধেশ্বরী মাতার মন্দিরের সম্মুখে গাড়ী থামিয়া গেল। শ্রীশ্রীজগদম্বার উদ্দেশ্যে তিনি ও আমি উভয়েই প্রণাম করিলাম। তিনি আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন—"যিনি দাঁড়িয়ে রয়েছেন তিনি কে জান?" আমি বলিলাম—"আমরা তো এঁকে 'বড় সিদ্ধেশ্বরীমা' বলে জানি (কারণ, আমাদের পল্লীতে আর একটি সিদ্ধেশ্বরী আছেন তিনি 'পুঁটে সিদ্ধেশ্বরী')" গিরিশচন্দ্র

শ্রীশ্রী সিদ্ধেশ্বরী প্রণাম-কালে লেখকের প্রতি গিরিশচন্দ্রের উপদেশ

বলিলেন—"দুই হাতে মুণ্ড-অসি ধরা আর দুই হাতে বরাভয়—দুটিতে দুষ্টের দমন, আর দুটিতে শিষ্টের পালন; এ তো তোমরা সকলেই জান। কিন্তু আমি জানি ও দুটি মাত্র বরাভয় দানের জন্য নয়। জগতের 'গিন্নীমা' প্রত্যেক ছেলেকে কোলে তুলে নেবার জন্য ডাকছেন—তোরা কে কোথায় আছিস্ আমার কোলে আয়।" গিরিশচন্দ্রের

গিরিশচন্দ্রের দেবভক্তি

এই অপূর্ব্ব ধারণা ও ব্যাখ্যা শুনিয়া আমরা যাহাতে ঐ ভাবে তাঁকে দেখিতে পারি ও জানিতে পারি তাহায় জন্য সচেষ্ট রহিলাম।

* * * * *

ইতঃপূর্ব্বে বলিয়াছি—'বকল্‌মা' দেওয়া নেওয়া সহজ ব্যাপার নহে। বকল্‌মা দেওয়ার পর গিরিশচন্দ্রের আত্মাভিমান বা নিজের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব প্রায় লোপ পাইয়াছিল। কি যেন এক অজ্ঞাত ঐশ্বরিক শক্তিতে তিনি সকল কার্য্যে পরিচালিত হইতে লাগিলেন। মন ও শরীর সেই শক্তির অধীন হইয়া গেল। যা কিছু করিতেন, বলিতেন বা লিখাইতেন, সবই যেন আদিষ্টভাবে। এ সকলের বহু দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। যেমন—হোমিওপ্যাথিক ঔষধ দিয়া রোগ

আরোগ্য করিবার সময় ভগবৎশক্তির উপর পূর্ণ নির্ভর করিয়া ঔষধাদি নির্ব্বাচন করিতেন। আর একটি ঘটনার কথা এখানে উল্লেখ করিলাম—আমাদের বাগবাজার পল্লীতে আত্মীয়সম্পর্কে আসিয়া শ্রীকেদারনাথ বসু (অধুনা পরলোকগত) কয়েক বৎসর বাস করিয়াছিলেন। তিনি বহু বৎসর পূর্ব্বে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের উপদেশ ও বাণী মানবমনের উন্নতিবিধায়ক জ্ঞানে মনে মনে তাঁহাদের শরণাপন্ন হন। গিরিশচন্দ্রের নাটকাবলীতে ঐরূপ নানা উপদেশবাণী পাঠ করিয়া বিশেষতঃ অতি সন্নিকটে বাস করিয়া তাঁহার সহিত পরিচিত হইবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। একদিন কেদারবাবু—যিনি পল্লীতে 'কটি মামা' নামে খ্যাত ছিলেন এবং গিরিশচন্দ্রের ন্যায় একজন অবৈতনিক হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক ছিলেন—গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে তাঁহার গাড়ীতে আপার চীৎপুর রোড দিয়া দক্ষিণাভিমুখে কোন কার্য্যের জন্য যাইতেছিলেন। অল্প দূরেই শ্রীশ্রীমদনমোহন জীউর মন্দিরের নিকটে যাইয়া তিনি গিরিশবাবুকে গঙ্গার তীর ধরিয়া যাইতে অনুরোধ করেন, যেহেতু ইহাতে তাঁহার গন্তব্যস্থানে যাওয়ার সুবিধা হয়। তাই গাড়ীটিকে সরু ষ্ট্রীট (বর্ত্তমানে দুর্গাচরণ ব্যানার্জী ষ্ট্রীট) দিয়া ঘুরাইয়া লইতে আদেশ দিতে বলেন। গিরিশচন্দ্র কিন্তু অটল অচল। তিনি বলিলেন—"যেমন যাচেছ্ যাক্, তোমাকে যেখানে দরকার হয় নামিয়ে দিয়ে যাবো।" কেদারবাবু জিদ্ করায় গিরিশচন্দ্র বলিলেন—"তুমি আমি তো কর্ত্তা নই, তাঁরই ইচ্ছায় সব কাজ হচেছ্।" কেদারবাবু তাহাতে উত্তর করেন—"মহাশয় এসব আপনাদের 'প্রেজুডিস্' (Prejudice)।"

গিরিশবাবু তখন বলিলেন—"তবে চল, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক্।" বলা বাহুল্য, গাড়ীটিকে তখন সরু ষ্ট্রীট দিয়া ঘুরাইয়া গঙ্গাতীর দিয়া যাইতে আদেশ দেওয়া হইল।

ঐ রাস্তার শেষে গঙ্গাতীরে যাইবার পথের মাঝখানে Port Trust Rly. line উত্তর-দক্ষিণে লম্বা হইয়া আছে। ঐ Line-এর উপর একখানি মালবোঝাই গাড়ী (Train) দাঁড়াইয়াছিল। রাস্তা বন্ধ থাকায় উঁহারা আর অগ্রসর হইতে পারিলেন না। গিরিশচন্দ্র তখন বলিলেন—"দেখলে তো বাপু, এখন যাই কি ক'রে?" কেদারবাবু বলিলেন—"মশাই, ও দু'চার মিনিট।" গিরিশচন্দ্র—"আচছা অপেক্ষা করা যাক্।" কিন্তু ১০।১২ মিনিট অপেক্ষা করিয়াও ট্রেন সরিল না, তখন গিরিশচন্দ্র বলিলেন—"গোড়ায়ই বলেছিলুম 'তুমি আমি কোন কাজের কর্ত্তা নই'—Man proposes God disposes (মানুষ ভাবায় বিধি মাপায়)।" বকলমা দানে

কিরূপভাবে আত্মোৎসর্গ করিতে হয় এই সামান্য ঘটনা হইতেও বুঝা যায়। গাড়ীটিকে শেষে পূর্ব্বের পথ ধরিয়াই যাইতে হইয়াছিল।

*　　*　　*　　*

অবতারত্বে গিরিশচন্দ্রের বিশ্বাস

পূর্ব্বে শ্রীশ্রীঠাকুরকে অবতার বলিয়া স্বীকার করার কথা বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীভগবান্ যখন যেরূপ আবশ্যক হয়, সেরূপ দেহ মন লইয়া বার বার এই পুণ্যভূমি ভারতে আবির্ভূত হইয়াছেন, একথা সকলেই শুনিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সংস্পর্শে আসিয়া সকল অবতারের প্রতি সকল মহাপুরুষের উপর গিরিশচন্দ্রের ভক্তি ও বিশ্বাস বদ্ধমূল হইয়াছিল। ইহার একটিমাত্র দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিতেছি।

অবতার-পুরুষদের অনেকের জীবনী তিনি নাটকে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। তাঁহার অপূর্ব্ব নাটক 'শঙ্করাচার্য্যে'র পাণ্ডুলিপি লেখা শেষ হয় কাশীধামে—তাঁহার স্বাস্থ্যের জন্য প্রবাস-বাসকালে। সুহৃদ্বর অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় (গিরিশচন্দ্রের শেষজীবনের নিত্যসহচর ও লেখক) আমাকে এক পত্রে জানাইয়াছিলেন—"কর্ত্তা (গিরিশবাবু) কাল শঙ্করাচার্য্য লেখা শেষ করিয়াছেন। আজ তাঁহার আদেশে প্রাতের দিকে সেই পাণ্ডুলিপি খানি 'শঙ্করটিলায়' গিয়া আচার্য্য শঙ্করের প্রতিমূর্ত্তির পাদমূলে কিছুক্ষণ রাখিয়া প্রণামান্তর ফিরিয়া আসি। শঙ্করাচার্য্য লেখা শেষ হইয়াছে জানিলে আপনি সুখী হইবেন বলিয়া আপনাকে পত্র দ্বারা এই সংবাদ জানাইলাম।"

গিরিশচন্দ্র ভক্তগোষ্ঠী সংগঠনে ব্রতী

গিরিশচন্দ্র নিজে ভক্ত হইয়া ক্ষান্ত হন নাই। তিনি যাঁহার কৃপা পাইয়াছিলেন, তাঁহার নিকটে নিজে যাইতেন এবং সঙ্গী ও বন্ধু-বান্ধবদিগকে সময় সময় উপস্থিত করিতেন। তন্মধ্যে প্রধানতম নাট্যাচার্য্য শ্রীঅমৃতলাল বসু এক মন্তব্যে অবিনাশচন্দ্রকে জানাইয়াছিলেন যে, গিরিশচন্দ্রের প্রসাদেই তাঁহারা শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপা পাইবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন।

সাধারণে জানেন, গিরিশচন্দ্র অমৃতলালের নাট্যজীবনের শিক্ষাগুরু ছিলেন; কিন্তু গিরিশচন্দ্র যে তাঁহার অধ্যাত্মজীবনেরও শিক্ষাগুরু ছিলেন, একথা অমৃতবাবু সগৌরবে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। ভক্ত-সাধক অমৃতলাল ভগবান্ 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের বাল্যলীলা' সম্বন্ধে যে ক্ষুদ্রগাথা

(তাঁহার শেষ জীবনের সাধনা) রচনা করিয়াছিলেন, তাহার একস্থানে তিনি লিখিয়াছেন—

(১) "স্মরি গুরু গিরিশের পদ-অরবিন্দ
সভায় অমৃত গাথে এ গীতগোবিন্দ।"

*　　*　　*

(২) "হে গিরিশ, ভক্তবীর, চরণে লুটায়ে শির,
কৃতজ্ঞ প্রাণের অর্ঘ্য করিছে প্রদান।
নাট্য-রবি কবি-বিশ্বে, স্নেহের অনুজ শিষ্যে
রামকৃষ্ণ পদপ্রান্তে দেওয়াইলে স্থান।"

অন্যত্র গিরিশ-বন্দনায়

(৩) "সাথী, মিত্র, গুরু তুমি, প্রণমি লুটায়ে ভূমি
চিরশিষ্য তরে স্থান রাখিও চরণে॥"

গিরিশচন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে কি ভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহার কয়েকটা দৃষ্টান্ত ইতঃপূর্ব্বে দিয়াছি। প্রাসঙ্গিকবোধে এখানে তাঁহার রচিত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ' নামক মহিমাবর্ণনাত্মক দীর্ঘ কবিতাটির কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম—

"সকল মঙ্গলালয়, পূর্ণ বিরাজিত,
প্রেমের আধার!
নির্ব্বিকার, হর্ষ-শোচ-বাসনা বর্জ্জিত,
জ্ঞানদীপ্ত মূর্ত্তি মহিমার!
পদরেণু বাঞ্ছিত গঙ্গার,
নির্ম্মল-অনিল স্পর্শে যাঁর;
উজ্জ্বল বিমল কান্তি, তাপিত জনের শান্তি,
চরণে হরণ ধরাভার,
শরেণ্য বরেণ্য আত্মা প্রণম্য সবার!

*　　*　　*

নিরৈশ্বর্য্য আসিয়াছ মাধুর্য্য লইয়ে,
প্রেমে আঁখি ঝরে,
মানব, মানব-মাঝে, পরশিতে হিয়ে,
অমিশ্রিত মাধুর্য্য অধরে;

পাছে নর নাহি আসে ডরে,
দীন বেশে ডাক সকাতরে ;
হরিবারে মন প্রাণ, কর নাথ আত্মদান,
সংসার ভুলাও কণ্ঠস্বরে,
নয়ন মাধুরী হেরি অভিমান হরে।
চিনালে চিনিতে পারে, নহে অসম্ভব
পুরুষ প্রধান!
মত্তচিত্ত মহাঘোর বিষয়-আহব
হৃদয়ে না রহে তব স্থান ;
স্বপ্রকাশ হও বিদ্যমান
জ্ঞানাঞ্জনে করি দৃষ্টিদান ;
তবু ক্ষণে মূঢ় মন, হয় রূপ বিস্মরণ,
ইন্দ্রিয় তাড়না বলবান্।
হৃদ্‌পদ্ম বিকশিয়া হও অধিষ্ঠান।।"

গিরিশচন্দ্রের উপর শ্রীশ্রীঠাকুরের উক্তির প্রভাব

ভগবান্ সাকার কি নিরাকার এ সম্বন্ধে জনৈক শিষ্য শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রশ্ন করিলে তিনি উত্তরে বলেন, "তাও বটে,—তাও বটে,—আর যদি কিছু থাকে,—তাও বটে।" গিরিশচন্দ্র সেখানে উপস্থিত ছিলেন। পরমহংসদেবের এই কয়টি কথায় তাঁহার কিরূপ মানসিক প্রতিক্রিয়া হইয়াছিল, সে সম্বন্ধে তাঁহার নিজের উক্তি হইতে অংশবিশেষ এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—

"তাঁহার (শ্রীশ্রীঠাকুরের) মুখে কথাটি শুনিয়া মনে উদয় হইল যে, ঈশ্বর ইন্দ্রিয়ের গোচর, মনের গোচর ও মনোবুদ্ধির অগোচর,—একেবারে তিনটি ভাব ফুটিয়া উঠিল। যেন বিশাল ভবার্ণবে ডুবিয়া গেলেম! এই ক্ষুদ্র কথায় বৃহৎ বস্তুর আভাস আসিয়া উপস্থিত হইল। শুষ্ক তার্কিক বুঝিল যে, সাকার-নিরাকার এই দুই বিশেষণে সেই বৃহৎ বস্তু বিঘোষিত হয় না। 'তাও বটে,—তাও বটে,—আর যদি কিছু থাকে,—তাও বটে'—একথার অর্থ জিজ্ঞাসা করিব ভাবিলাম, কিন্তু আর জিজ্ঞাসা করিতে পারিলাম না। সেই বৃহৎ গুরু রামকৃষ্ণের প্রভাবে উত্তর আপনি হৃদয়ে উঠিল। বুঝিলাম, আমি অতি ক্ষুদ্র। মনোবুদ্ধিতে যাহা উঠে, তাহাই বুঝিতে পারি, ঈশ্বরের স্বরূপ বুঝিবার আমার শক্তি নাই।"

* * *

গুরু বলিতেন—“তিনি রস,—আমরা রসিক।” কথাটি কি আনন্দময়। কথাটি শুনিয়া আমি প্রথমে বুঝিতে পারি নাই। কিন্তু যে দিন—“তাও বটে, —তাও বটে,—আর যদি কিছু থাকে,—তাও বটে” এই কথাটি শুনিয়া রস কি তাহা বুঝিলাম; তখন সে রসে রসিক হওয়া কি, তাহারও আভাস পাইলাম। মনে উঠিতে লাগিল যে, সে রসের রসিকের কর্ণে সাংসারিক কলরব উঠিবার সম্ভাবনা নাই।

* * *

“তাও বটে,—তাও বটে,—আর যদি কিছু থাকে,—তাও বটে”—একথা মনে আনিতে গেলেই মন গলিয়া যায়! চিন্তাতেই চিত্ত স্থির হয়। আর যদি কিছু থাকে—সে কি? সাকার নয়—নিরাকার নয়—সে কি? যেন কোন বিশাল রাজ্যে গিয়া উপস্থিত হই, সে দেশে রজনী নাই, চেতন-অচেতন অবস্থার ভেদাভেদ নাই, বিপুল রাজ্য—অনন্ত রাজ্য—নির্ব্বাক্ রাজ্য! ঈদৃশ ভাবাপন্ন হইয়া আমি মূঢ় বুদ্ধিতেও বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে, “মন্ত্রমূলং গুরোর্বাক্যম্” এবং গুরুর বাক্য গুরুকৃপায় ধারণা হয়। সেই নিমিত্তই “মোক্ষমূলং গুরোঃ কৃপা।”

পরিশিষ্ট

গিরিশচন্দ্রের রচনাবলীর পূর্ণ তালিকা

(ক) থিয়েটারে অভিনীত নাটক, গীতিনাট্য ও প্রহসন

১। মাউসি
২। Charitable Dispensary
৩। ধীবর ও দৈত্য
৪। আলিবাবা
৫। দুর্গাপূজার পঞ্চরং
৬। Circus Pantomime
৭। যামিনী চন্দ্রমাহীনা—গোপন চুম্বন (A kiss in the dark)
৮। সহিস হইল আজি কবিচূড়ামণি
৯। আগমনী
১০। অকালবোধন
১১। দোললীলা
১২। মায়াতরু
১৩। মোহিনী প্রতিমা
১৪। আলাদিন
১৫। আনন্দ রহো
১৬। রাবণবধ
১৭। সীতার বনবাস
১৮। অভিমন্যুবধ
১৯। লক্ষ্মণবর্জন
২০। সীতার বিবাহ
২১। ব্রজবিহার
২২। রামের বনবাস
২৩। সীতাহরণ
২৪। ভোটমঙ্গল
২৫। মলিন মালা
২৬। পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস
২৭। দক্ষযজ্ঞ
২৮। ধ্রুবচরিত্র
২৯। নলদময়ন্তী
৩০। কমলেকামিনী
৩১। বৃষকেতু
৩২। হীরার ফুল
৩৩। শ্রীবৎস-চিন্তা
৩৪। চৈতন্যলীলা
৩৫। প্রহ্লাদ চরিত্র
৩৬। নিমাইসন্ন্যাস
৩৭। প্রভাসযজ্ঞ
৩৮। বুদ্ধদেব-চরিত
৩৯। বিল্বমঙ্গল ঠাকুর
৪০। বেল্লিকবাজার
৪১। রূপসনাতন
৪২। পূর্ণচন্দ্র
৪৩। নসীরাম

৪৪। বিষাদ
৪৫। প্রফুল্ল
৪৬। হারানিধি
৪৭। চণ্ড
৪৮। মলিনা-বিকাশ
৪৯। মহাপূজা
৫০। ম্যাক্‌বেথ
৫১। মুকুলমুঞ্জরা
৫২। আবুহোসেন
৫৩। সপ্তমীতে বিসর্জন
৫৪। জনা
৫৫। বড়দিনের বখ্‌সিস
৫৬। স্বপ্নের ফুল
৫৭। সভ্যতার পাণ্ডা
৫৮। করমেতি বাই
৫৯। ফণীর মণি
৬০। পাঁচ কনে
৬১। কালাপাহাড়
৬২। হীরক জুবিলী
৬৩। পারস্যপ্রসূন
৬৪। মায়াবসান
৬৫। দেলদার
৬৬। পাণ্ডবগৌরব
৬৭। মণিহরণ
৬৮। নন্দদুলাল
৬৯। অশ্রুধারা
৭০। মনের মতন
৭১। অভিশাপ
৭২। শাস্তি
৭৩। ভ্রান্তি
৭৪। আয়না
৭৫। সৎনাম
৭৬। হরগৌরী
৭৭। বলিদান
৭৮। সিরাজদ্দৌলা
৭৯। বাসর
৮০। মীরকাসিম
৮১। য্যায়সা কা ত্যায়সা
৮২। ছত্রপতি শিবাজী
৮৩। শাস্তি কি শান্তি
৮৪। শঙ্করাচার্য্য
৮৫। অশোক
৮৬। তপোবল
৮৭। গৃহলক্ষ্মী
৮৮। নিত্যানন্দ বিলাস
৮৯। চাবুক
৯০। বিধবার বিবাহ

(খ) উপন্যাস ও গল্প—১৮
(গ) কাব্য—১
(ঘ) জীবনী —১
(ঙ) প্রবন্ধ—১৮
(চ) নাট্যপ্রবন্ধ —১৪
(ছ) শোকপ্রবন্ধ—৮
(জ) সামাজিক প্রবন্ধ—২
(ঝ) বিজ্ঞানপ্রবন্ধ—২
(ঞ) বিবিধ প্রবন্ধ—১২

গিরিশচন্দ্রের উইল

I, Girish Chunder Ghosh, a Hindu inhabitant of Calcutta residing at No. 13 Bose Para Lane, Baghbazar, make this my last Will & Testament revoking all former Wills Trusts to the following effects :—

I hereby appoint my brother Bavu Autul Krishna Ghosh, a Vakil of the High Court, Calcutta, who has been living jointly with me since the death of our father late Nil Comol Ghosh and who is the only surviving co-partner in the joint ancestral properties as Executor and Trustee of my Estate and Will.

My only son Surendra Nath Ghosh *alias* Dani a Dramatic actor by profession is a bachelor, to my mind he is not a fit person to be entrusted with my property, so I directed my Executor and Trustee to give him, the said Dani, a suitable maintenance from my estate, the nature and amount whereof shall be settled and fixed entirely at his discretion. In case the said Surendra Nath Ghosh think it proper to marry in the Hindu Form of Orthodox style, My Executor and Trustee shall also provide him and his family a permanent residence in the family dwelling house No. 13, Bose Para Lane in Calcutta.

My ancestral tutelar God Sri Sri Sreedharjee is located in our said family dwelling house 13, Bose

Para Lane as aforesaid, I directed my Executor and Trustee to carry on the daily seva of the said Thacoor in the style it is carried on at present from our joint estate. In case it be necessary to sell the joint family dwelling house from any cause whatsoever, my said Executor must provide so soon as practicable a permanent place of residence of my son Surendra Nath Ghosh, Dani, and also for the family Thacoor Sreedharjee. My sister Dakhina Kally Dassi shall also have a right of residence in our family dwelling house or in the new Thacoorbati so long as she would be willing and desirous to serve her parent's said Thacoor. But her Palit Putra my another sister's son Benode Lall Shom who now resides with me can have such a right only with the sufferance of my said Executor and Trustee.

Out of my joint immovable properties in Calcutta I give and bequeath to my daughter's son Durga Prasanno Bose and Bhogobathi Prasanna Bose both infants the whole sixteen annas of the khirkee land No. 11, Ram Kanto Bose's Second Lane in Calcutta, with the consent of my brother absolutely but they shall take it as joint tenants that is to say (God forbid) in case of death of one without family and children the brother shall succeed to his share by survivorship. Until Durga Prasanno Bose comes to the age of majority my Executor and Trustee shall hold his subjects to the payment of rents and profits to them or their natural Guardian. I also give them absolutely the copyright of the 1st, 2nd and 3rd Volumes of my Dramatic works called the

Girish Granthabali but my Executor shall also hold these books on the same condition as the aforesaid immovable property No. 11, Ram Kanto Bose's 2nd Lane. I also enjoin upon my Executor and Trustee to help my daughter's sons (fund permitting) to erect a suitable residence upon a portion of the above plot of land so devised.

In addition to the trust here-in-before enumerated I give and bequeath the whole of my ancestral joint properties and my self-acquired properties movable and immovable which I hold jointly or separately to my brother the said Autul Krishna Ghosh, the Executor and Trustee of this my Will for his natural life subject to the trust created hereby. I further direct that my said brother during his life shall have full control of sale and purchase of my estate subject however to the trust aforesaid and that after his death the portion of my estate remaining in his hand shall go to my son or my natural heirs and not his my said brother Autul Krishna Ghosh's natural heirs at the time.

Dated the 20th day of June One thousand nine hundred and four.

Signed in the presence of the undermentioned witnesses, who in his presence and in the presence of one another signed their respective names and attesting witnesses to his Will.

(Sd.) Girish Chandra Ghosh.

Baikantha Nath Sanyal,

Clerk, Govt. Stationery Office, Calcutta. At present 20, Bose Para Lane, Cal.

Nagendra Krishna Mallick,
No. 1, Sib Sankar Mallick Lane, Calcutta.

Salieshwar Bose,
Cashier I. V. Wharver, Port Commissioners Office.
At present 12, Ram Kanto Bose's 1st Lane,
Baghbazar, Calcutta.

যে সকল রচনা ও গ্রন্থের সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছে তাহার তালিকা

গ্রন্থ প্রারম্ভে 'নিবেদনে' উল্লিখিত লেখকের নিজ রচনাবলী।

সুহৃদ্বর অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় রচিত 'গিরিশচন্দ্র' (১ম ও ২য়)।

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত 'গিরিশ গীতাবলী'।

'গিরিশ-গ্রন্থাবলী'।

শ্রী 'ম' কথিত—'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত'।

শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দ রচিত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ'।

'বঙ্গশ্রী' নামক মাসিক পত্রিকায় (১৩৪৮) প্রকাশিত—'শ্রীরামকৃষ্ণ ও গিরিশচন্দ্র'।

স্বামী চন্দ্রেশ্বরানন্দ সম্পাদিত (সাপ্তাহিক) 'ভারত', ৩য় বর্ষ—'বাগবাজার' নামক প্রবন্ধ।

২।৩।৪ বর্ষ নাট্যমন্দিরে প্রকাশিত গিরিশচন্দ্র সম্বন্ধে অন্যান্য লেখকের প্রবন্ধাবলী।

শ্রীসুধীরকুমার মিত্র সঙ্কলিত 'হুগলী জেলার ইতিহাস'।